শ্রী শ্রী দুর্গা পূজা

Sri Sri Durga Puja

# পূজারী

# Pujari, Atlanta

১৬–১৭ আশ্বিন ১৩৯৯

October 3-4, 1992

# শ্রী শ্রী দুর্গা পূজা - ১৩৯৯

## SRI SRI DURGA PUJA - 1992

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপাদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।।

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দনন্দস্বরূপে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।।

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ক্ষুধার্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারদাত্রি
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।।

দুর্গা পূজার অনুষ্ঠান সূচী:

শনিবার, ১৬ই আশ্বিন, ১৩৯৯

| | |
|---|---|
| পূজা | বেলা দশটা |
| অঞ্জলি | বেলা বারোটা |
| প্রসাদ | বেলা একটা |
| বিচিত্রানুষ্ঠান | বিকেল সাড়ে তিনটে |

বাংলা নাটক:
"কেনারাম বেচারাম"

| | |
|---|---|
| সন্ধ্যারতি | রাত্রি আটটা |
| প্রসাদ | রাত্রি ন'টা |

রবিবার, ১৭ই আশ্বিন, ১৩৯৯

| | |
|---|---|
| পূজা | বেলা দশটা |
| অঞ্জলি | বেলা বারোটা |
| প্রসাদ | বেলা একটা |

1992 Durga Puja Program:

Saturday, October 3, 1992

| | |
|---|---|
| Puja | 10 am |
| Anjali | 12 noon |
| Prosad | 1 pm |
| Entertainment | 3:30 pm |

Bengali Play:
"Kenaram Becharam"

| | |
|---|---|
| Arati | 8 pm |
| Prosad | 9 pm |

Sunday, October 4, 1992

| | |
|---|---|
| Puja | 10 am |
| Anjali | 12 noon |
| Prosad | 1 pm |

Pujari Durga Puja
Brochure - 1992

Editors:
Samar Mitra
Jayanti Lahiri
Suzanne Sen
Amitava Sen

Computer Typing:
Amitava Sen
Rekha Mitra

Cover, and Brochure Design:
Amitava Sen

Computer Software & Fonts:
Printed using "Sampadak" Multilingual Word Processor written & published by Amitava Sen; and miscellaneous other scanning, graphics, and word processing software.

Production:
Amitava Sen
Asok Basu

Published by:
Pujari
4515 Holliston Road
Doraville, Georgia 30360

tel: (404) 451-8587

পূজারীর দুর্গা পূজা
পুস্তিকা - ১৩৯৯

সম্পাদক:
সমর মিত্র
জয়ন্তী লাহিড়ী
সুজ্যান সেন
অমিতাভ সেন

কম্পিউটার মুদ্রণ:
অমিতাভ সেন
রেখা মিত্র

প্রচ্ছদ, এবং পুস্তিকা ডিজাইন্:
অমিতাভ সেন

কম্পিউটার সফ্টওয়ার ও লিপি:
অমিতাভ সেন রচিত “সম্পাদক” বহুভাষী ওয়ার্ড প্রসেসর দ্বারা মুদ্রিত। এ ছাড়া বিবিধ স্ক্যান, গ্রাফিক্স, ও ওয়ার্ড প্রসেসর সফ্টওয়ার ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রতিলিপি:
অমিতাভ সেন
অশোক বসু

প্রকাশনা:
পূজারী

# সূচীপত্র
# Contents


রচনা (Articles)
- Samar Mitra - দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ 4
- Ranes Chakravorty - স্বপ্ন-বাসবদত্তা 6
- Sambhu Nath Sen - স্মৃতির বুদ্‌বুদ্‌ 14
- Archana Mukherji Kumar - কাল চিন্তন 21
- Samar Mitra - Ramayana and Durgapuja 22
- Lali Watt - Maintaining Cultural Integrity 24

কবিতা (Poetry)
- Ashimdeb Goswami - কলকাতার চিঠি 16
- Pranab Kumar Lahiri - কলকাতার স্মৃতি 17
- Amitava Sen - কলকাতার শ্রাবণ 18
- Md. Musharatul Huq Akmal - আমার মা এবং এই বিদেশে 19
- Susmita Mahalanobis - জন্ম 20
- Yasho Lahiri - Eventide 32

গল্প (Stories)
- Rekha Mitra - তারাসুন্দরী 8
- Kalpana Das - অতীতের কথা 12
- Jayanti Lahiri - Who would expect? 26
- Amitava Sen - Masks of Papier-mâché 29

অঙ্কন (Drawings)
- Amitava Sen 1,18,32,33
- Rekha Mitra 1,13,16,17,25,28
- Mimi Sarkar 20

ছোটদের থেকে (From the younger set)
- Marjorie Sen - drawing 29
- Anirban Das - Have a Voice, Moody Blues (poems) 33
- Reshma Gupta - The phone bill that never arrived (story) 34
- Nandini Banik - The departure (poem) 35
- Rajarshi Gupta - Dealing with wealth (poem) 35
- Priyanka Mahalanobis - The story of Reggie 36
- Sandip Mitra - drawing 36
- Pia Basu - My dog daisy (and drawing) 37

বিবিধ (Miscellaneous)
- Entertainment program 38
- Special thanks - 40
- Statement of accounts 41

# দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ

সমর মিত্র

চণ্ডীতে দেবীর আরাধনার চারটি বিশেষ স্তোত্র আছে। চারটি এবং বিশেষ বলার কারণ এই যে যদিও গোটা চণ্ডীটাই দেবীর ভাবনাকে অবলম্বন করে, তাহলেও তার মধ্যে থেকে চারটিকে বিশেষ করে আলাদা করা যায়। প্রথমটি প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখ দিয়ে আমাদের শুনিয়েছেন চণ্ডীর রচয়িতা মার্কণ্ডেয় মুনি মধু ও কৈটভ বধের জন্য বিষ্ণুকে যোগনিদ্রা থেকে জাগাতে। দেবতারা সম্মিলিত হয়ে দ্বিতীয় স্তোত্রটি আবৃত্তি করেছিলেন মহিষাসুর বধের পর। তৃতীয়টিতে পাই শুম্ভ ও নিশুম্ভের অত্যাচারে জর্জরিত দেবতাদের দেবীকে আরাধনার মন্ত্রসমষ্টি। এই দুই অসুর বধের পর নিষ্কণ্টক হয়ে দেবতারা অন্তর উজাড় করে দেবীর যে স্তুতি করেছিলেন সেই চতুর্থ ও শেষ স্তোত্রটির প্রথম তিনটি কথা 'দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ' (চণ্ডী ১১:৩)।

দেবী হলেন দিব্যশক্তি। এই শক্তিতে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়ে চলেছে অনাদিকাল থেকে। সেই শক্তি নানারূপে প্রতিফলিত হচ্ছে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মাধ্যমে। মানুষের মধ্যে কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, সঙ্গীতজ্ঞ ইত্যাদি সকলে তাঁরই শক্তিতে শক্তিমান। অনেকদিনের পুরোণো একটা গানের কথা - 'সবার শক্তি তুমি মাগো, তোমার শক্তি তুমি'। এই সত্যটি না জানার ফলে নিজের শক্তি ভেবে শক্তিমানরা গর্ববোধ করেন, ধরাকে সরাজ্ঞানও করেন অহঙ্কারে মত্ত হয়ে। এই শক্তির উৎসটি কোথায় সেটা বুঝিয়েছেন কেনোপনিষদের ঋষি ছোট্ট একটি রূপকের মাধ্যমে। দানবদের পরাজিত করে দেবতারা নিজেদের শৌর্য্য বীর্য্যের প্রশংসা করছিলেন এমন সময় অদূরে আবির্ভাব হল অপরিচিত সম্ভ্রান্ত এক মূর্ত্তির। দেবতাদের মধ্যে জটলা সুরু হয়ে গেল। সবাই মিলে তাঁর সম্মুখীন হবার ভরসা না পেয়ে তাঁরা অগ্নিদেবতাকে নির্বাচন করলেন তাঁর পরিচয় জেনে আসতে। অগ্নি গিয়ে আগন্তুকের প্রশ্নের উত্তরে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন সব কিছু গ্রাস করার শক্তি ধরেন তিনি। সেই মূর্ত্তি ছোট্ট এক চিলতে ঘাস অগ্নির সামনে রেখে গ্রাস করতে বললেন। কিন্তু বহু চেষ্টায়ও অগ্নি কিছুই করতে পারলেন না। লজ্জিত হয়ে ফিরে এসে দেবতাদের তিনি জানালেন তাঁর ব্যর্থতার কথা। তার পরে বায়ু গিয়েও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন। এবার গেলেন দেবরাজ ইন্দ্র। সেই মূর্ত্তি ইন্দ্র কাছে আসার আগেই অদৃশ্য হলেন - সেইখানে দেখা দিলেন সোনার বরণ অপরূপা এক দেবীমূর্ত্তি। ইনিই শক্তি - যে শক্তি আর ব্রহ্ম অভেদ। সেই শক্তিই মূর্ত্তিমতী হয়ে দেবতাদের সংশয় দূর করলেন - ভাবনার মোড় দিলেন ঘুরিয়ে, জানালেন যে সেই ব্রহ্মণ্ই মূর্ত্ত হয়েছিলেন তাঁদের শিক্ষার জন্যে (কেনোপষিদ্ ৩য় খণ্ড)।

চতুর্থ স্তুতিটির পর্য্যায়ে আসার অনেক আগেই কিন্তু চণ্ডীর দেবতাদের ভাবনার মোড় ঘুরে গেছে। মহিষাসুর বধের পর দেবতাদের স্তবে প্রসন্না হয়ে দেবী বর দিতে চাইলে দেবতারা বলেছিলেন যে অসুর বধ করেই দেবী তাদের সমস্ত কামনা পূর্ণ করেছেন - বিশেষ করে চাইবার কিছু নেই। তবে দেবী যখন বর দিতে চেয়েছেন তখন এই বর দিন যে ভবিষ্যতে বিপদে পড়ে তাঁকে স্মরণ করলে তিনি যেন এইভাবে আবার এসে বিপন্মুক্ত করেন। দিব্য সেই শক্তির সশ্রদ্ধ স্মরণ হল তাঁর শরণাপন্ন হওয়া - প্রপন্ন শব্দটি হল সেই শরণাগতির চরম অবস্থা। কুরুক্ষেত্রে,

যুদ্ধের প্রারম্ভে, বিক্রমে যিনি অতুলনীয় সেই অর্জুনও দিশাহারা হয়ে তাঁর সখা আর সারথির মধ্যে আবিষ্কার করলেন ইষ্টকে, গুরুকে – জানলেন তাঁর পরিত্রাণদাতাকে – জানালেন তাঁকে শিষ্য করার প্রার্থনা, নিলেন তাঁর শরণ, আকুতি জানিয়ে বললেন – শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ (গীতা ২:৭) – 'আপনার শরণাপন্ন আমাকে শিক্ষা দিন'। আর্তির চরম অবস্থা তখন অর্জুনের – জীবনের মোড় ঘোরানোর জন্য প্রয়োজন ছিল তাঁর এই চরম বিপদের অনুভূতি। এই বিপদের রূপেই এল ঈশ্বরের কৃপা – শরণাগতির পথ দেখতে পেলেন অর্জুন।

আর্তি না এলে আর্তিহরাকে ভাবনার মধ্যে স্থান দেওয়া যায় কই? শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন যে চার ধরণের সুকৃতিশালী (গীতা ৭:১৬) মানুষ আছে। সুকৃতিশালী কেন – কারণ তাঁরা আমার ভজনা করেন। এই ভজনা করার প্রবৃত্তি আসে কোথা থেকে? প্রথমেই বললেন বিপন্ন বা আর্তভাব থেকে। এই আর্তি নানাজনের নানাভাবে আসে – তার আবার স্তরভেদ আছে। সর্বশ্রেষ্ঠ আর্তি হল যা আসে ঈশ্বরদর্শনলাভের ব্যাকুলতা থেকে। স্বল্পায়ু কজন মানুষের জীবনে এই আকাঙ্খা জাগে আর সেই আকাঙ্খা পূর্ণ না হওয়ার জন্যে বিপন্ন বোধ করে কজন? একমাত্র সুকৃতিশালীদের পক্ষেই তা সম্ভব। সাধনার পরিণত অবস্থায়ও যখন শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের দর্শন পান নি তখন তাঁর আর্তি কি করুণভাবেই না প্রকাশ করেছেন তিনি। বলেছেন, 'মাগো, জীবনের আর একটা দিন ফুরিয়ে গেল তবু তোর দেখা পেলাম না!' করুণাময়ীর আসন তখনই না নড়ে উঠল!

চণ্ডীর কয়েকটি শ্লোকে এই আর্ত আর আর্তি শব্দদুটির ব্যবহার করেছেন ঋষি। প্রথমটি পাই যখন দেবীকে বার্ত্তারূপে সমস্ত জগতের পরম আর্তিহন্ত্রী বলে অনুভব করেছিলেন দেবতারা (চণ্ডী ৪:৯)। বার্ত্তাশব্দের দুটি অর্থ করা যায়। একটি হল চলমান কালের সঙ্গে লীলাময়ী মায়ের লীলা। এই লীলা প্রকাশের মাধ্যমে আর্তিবোধ জাগিয়ে তাকে বিনাশ করছেন মহামায়া। বুদ্ধদেবের বোধিলাভ এই আর্তি থেকেই না সম্ভব হয়েছিল! বার্ত্তার দ্বিতীয় অর্থ হল বৃত্তি বা জীবিকা। জাগতিক অর্থে এই জীবিকার মাধ্যমে সর্বজীবের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে তিনি যে নিয়ত আর্তি হরণ করে চলেছেন সে কথা আমরা বুঝতে পারি কই!

দ্বিতীয় একটি শ্লোক যেটা আমরা মায়ের পূজারতির সময় আবৃত্তি করি – 'শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে, সর্বস্যার্তি হরে দেবী নারায়ণি নমোহস্তুতে' (চণ্ডী ১১:১২), সেটিতে আর্ত আর আর্তি এই দুটো শব্দই রয়েছে। আর্তভাব থেকে যাদের আসে দীনতা আর শরণাগতি, প্রত্যক্ষভাবে দেবী তাদের আর্তি হরণ করেন। আর সবারও করেন – তবে সেটা পরোক্ষভাবে – আমরা টের পাই না এইমাত্র। আর একটি শ্লোকে (চণ্ডী ১১:৩৪), বিশ্বের আর্তিহারিণী দেবীকে প্রণাম জানিয়ে প্রসন্না হতে প্রার্থনা জানাচ্ছেন দেবতারা – 'প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণী' বলে – ঐটি আর 'দেবী প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ' কথা তিনটির ভাবার্থ প্রায় এক। আসুন, দেবতাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও বলি –

প্রসন্না হইয়া তুমি বেদনা হরণ,
কর মাগো যেই লয় শরণ তোমার,
দেবী তুমি হও তুষ্টা করি নিবেদন,
তুমি মাতা এ অখিল জগতে সবার।
প্রসন্না হও মা তুমি কর বিশ্ব রক্ষা,
তুমি যে সমগ্র এই বিশ্বের ঈশ্বরী,
ঈশ্বরী তুমিই দেবী পাইলাম শিক্ষা,
চরাচর এই ভুবনের সকলেরি।

# স্বপ্ন-বাসবদত্তা

রণেশ চক্রবর্তী (Salem, VA)

প্রাচীন ভারতের বহু লেখক-কবির মধ্যে কালিদাসের বাইরে বড় কাউকে আমরা চিনি না। বেদ-উপনিষদের কথা ছেড়েই দিলাম - রামায়ন-মহাভারতও সম্পূর্ণ অনুবাদ আমরা কমই পড়েছি। বহু শতাব্দীর অন্তরাল থেকে আবছা দেখা এরকমই একজন নাট্যকারের রচনা সম্প্রতি আমার পড়ার সুযোগ হয়েছে। তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করছি।

প্রাচীন ভারতের সুধীজনের সঠিক হিসেব পাওয়া শক্ত। পশ্চিমী সভ্যতায় আত্মম্ভরিতার প্রকাশ হিসাবে ব্যক্তিগত ইতিহাস লেখা বহুকাল আগেই চালু হয়েছে। হিন্দু ভারতে তা হয় নি। যদি হয়ে থাকে তবে সে সব রচনা-ইতিহাস বহুলাংশে হারিয়ে গেছে।

আমাদের পূর্বপুরুষরা মনে করতেন, বিদ্যার অহংকার অনুচিত। তাই তাঁরা প্রায়শই তাঁদের রচনার কৃতিত্ব দিয়েছেন গুরুকে অথবা প্রথিতযশা প্রাচীন কাউকে। আজ যেমন যে জিনিস যত অর্বাচীন তার কদর ততই বেশি - প্রাচীন ভারত ছিল এর একেবারে বিপরীত।

সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের মত বিখ্যাত কবি আর নেই। তাঁরও ঐতিহাসিক তথ্য প্রায় কিছুই হাতে নেই। খ্রীষ্টজন্মের একশ বছর আগে না চারশ বছর পরে তাই নিয়েই তর্ক এখনও শেষ হয় নি। কালিদাসের আগের কালে যেসব লেখক ছিলেন (যাঁরা ধর্ম, ন্যায়, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে লেখেন নি, শুধু রম্যরচনা করেছেন, তাঁদের কথা বলছি) তাঁদের মধ্যে অশ্বঘোষের "বুদ্ধচরিত" সিদ্ধার্থ গৌতমের অপার্থিব জীবন আমাদের গোচরে এনেছে। ভাস যেন আরও রহস্যময়। বারবার প্রশংসিত এই নাট্যকারের কোনো লেখা বহুকাল পাওয়া যায় নি।

১৯০৯ সালে মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী কটি পুরনো পাণ্ডুলিপিতে দশটি সম্পূর্ণ ও তিনটি অসম্পূর্ণ নাটক আবিষ্কার করেন। যদিও কোনো নাটকেই ভাস আত্মপ্রকাশ করেন নি (আগেই বলেছি, এটাই ছিল নিয়ম, ব্যতিক্রম নয়) প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের গোয়েন্দারা আর ঐতিহাসিকরা স্বীকার করে নিয়েছেন, যে, এ নাটকগুলি ভাস-এরই রচনা।

ভাসের এই নাটকগুলির মধ্যে "স্বপ্ন-বাসবদত্তা" (স্বপ্নবাসবদত্তম্) বোধহয় সবার উপরে বিখ্যাত। ছটি ছোট অংকে রচিত এই নাটকে পুরনো হিন্দু সভ্যতার যে-ছবি আসে তা অনেকাংশে বিস্ময়কর।

সংক্ষেপে গল্পটা বলি। স্বপ্নবাসবদত্তা মগধরাজ দর্শকের বোন পদ্মাবতী, অবন্তীরাজ উদয়ন এবং তাঁর প্রথমা স্ত্রী উজ্জয়িনীরাজ মহাসেন প্রদ্যোতের কন্যা বাসবদত্তাকে নিয়ে। এর মধ্যে কম সময়ের জন্য এসেছেন উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ন, বিদূষক বসন্তক ও অন্যান্য কতগুলি নাম-না-জানা চরিত্র - যথা, কঞ্চুকী, প্রতিহারী, চেড়ী ইত্যাদি।

নাটকের শুরু রাজগৃহের কাছের একটি তপোবনে। মগধরাজ দর্শকের বোন পদ্মাবতী এসেছেন তাঁর মার সঙ্গে দেখা করে রাত্রি যাপন করতে। দেখা যাচ্ছে, মহারানী বার্ধক্যে বাণপ্রস্থে তপোবনে এলেও ছেলেমেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়েন নি। পদ্মাবতী মোটেই অসূর্যম্পশ্যা নন। তিনি অবিবাহিত-সহচরদের সাথে একাই এসেছেন এবং যখন উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ন (ছদ্মবেশে) দেখা করতে চাইলেন তখন তাঁর সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথা বলছেন।

উদয়ন নিজের রাজধানী থেকে স্ত্রী বাসবদত্তাকে নিয়ে লাবাণক গ্রামে এসে আছেন। শত্রুরাজা আরুণির হাতে তিনি পরাজিত - নিজের রাজ্য ফিরে পাবার চেষ্টা করছেন। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ন দেখলেন মগধের রাজকুমারী পদ্মাবতীর সাথে উদয়নের বিবাহ হলে মগধরাজ দর্শকের সাহায্যে আরুণিকে হারানো সম্ভব হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে যখন উদয়ন লাবাণক গ্রামে নেই তখন বাসবদত্তাকে সামান্য আবন্তিকা নারীর ছদ্মবেশে যৌগন্ধরায়ন নিয়ে এসেছেন পদ্মাবতীর সঙ্গে দেখা করতে। নিজেও ছদ্মবেশে পদ্মাবতীর কাছে বোন বাসবদত্তাকে কদিনের জন্য রেখে যাবার অনুমতি চাইলেন। অভিপ্রায়, বাসবদত্তা যদি পদ্মাবতীর আশ্রয়ে থাকেন তবে পরে কোন নিন্দা হবে না (সীতার নিগ্রহের কথা কোন হিন্দুরমণীর ভোলা সম্ভব কি?)। যৌগন্ধরায়ন প্রচার করে দিলেন যে উদয়নের অবর্তমানে এক অগ্নিকাণ্ডে বাসবদত্তা ও যৌগন্ধরায়ন দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে।

যদিও হিন্দু পুরুষের (বিশেষ করে রাজার) বহুবিবাহে সামাজিক আপত্তি ছিল না - বাসবদত্তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়ানোর কারন বোধ হয় উদয়নকে ছলনা করবার জন্য। পরে দেখা যাচ্ছে, উদয়নের বাসবদত্তার প্রতি প্রেম অতি গভীর - বাসবদত্তা বেঁচে আছেন জানলে উদয়ন হয়ত আবার বিয়ে করতে রাজি হতেন না।

স্ত্রী বিয়োগে কাতর উদয়ন যখন ঘুরতে ঘুরতে মগধে এসেছেন তখন পদ্মাবতী তাঁকে দেখে মুগ্ধ এবং উদয়নকে বিয়ে করতে সম্মত (যদিও এর আগেই মহাসেন প্রদ্যোতের ছেলেকে বিয়ে করতে রাজি হন নি)। বোঝা যায়, যে, বিবাহের ব্যাপারে মেয়েদের অভিমতের যথেষ্ট দাম ছিল।

বিয়ের মালা গাঁথার ভার পড়ল ছদ্মবেশী বাসবদত্তার ওপর। যদিও স্বামীর পুনর্বিবাহে বাসবদত্তা দু:খিত তবুও পদ্মাবতী বা উদয়ন কারু ওপরই তাঁর রাগ নেই। বহুবিবাহ প্রচলিত - সুতরাং বাসবদত্তা স্বচ্ছন্দেই এই বিবাহকে স্বীকার করে নিচ্ছেন। এমনকি পদ্মাবতীর দৈহিক ও স্বভাবের সৌন্দর্য প্রশংসা করছেন।

বিবাহের পরও উদয়ন কিছুতেই বাসবদত্তাকে ভুলতে পারছেন না। বিদূষকের সঙ্গে আলাপে বলছেন, যে, বাসবদত্তার প্রতি তাঁর প্রেম অটুট আছে। ইতিমধ্যে একদিন উদয়ন "সমুদ্রগৃহে" ঘুমিয়ে পড়েছিলেন - পদ্মাবতীকে খুঁজতে খুঁজতে বাসবদত্তা ঘুমন্ত উদয়নের কাছে যান। ঘুমের ঘোরে উদয়ন বাসবদত্তাকে আবার প্রেম নিবেদন করেন - আসল বাসবদত্তাকে স্বপ্নে দেখছেন ভেবে (এইজন্যই নাটকের নাম স্বপ্ন-বাসবদত্তা)। (সমুদ্রগৃহ বোধহয় রাজবাড়ির অদূরে নদী কিংবা সমুদ্রের ধারে বিশ্রামাগার ছিল)। বাসবদত্তা নিদ্রিত স্বামীকে এখনও নিজের পরিচয় দিলেন না।

ইতিমধ্যে দর্শকের সাহায্যে উদয়ন আরুণিকে পরাজিত করে অবন্তীরাজ্য ফিরে পেলেন। উজ্জয়িনীরাজের দূত হিসাবে বাসবদত্তার পুরনো কালের ধাইমা এলেন উদয়নের সাথে দেখা করতে। তিনি অবশ্য বাসবদত্তাকে দেখে চিনতে পারলেন। এখানে আবার কথা প্রসঙ্গে বেরুল, যে, উদয়ন ভাল সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি বাসবদত্তাকে নিয়ে অবন্তীতে চলে আসেন। উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোৎ পরাক্রান্ত রাজা। তিনি মেয়ের পলায়নে আপাতদৃষ্টিতে বিচলিত হন নি। মেয়ে-জামাইয়ের আলেখ্য আঁকিয়ে তাদের বিয়ে দিয়েছেন। এবার সেই আলেখ্য দেখিয়ে বাসবদত্তা স্বীকৃতি পেলেন এবং আবার উদয়ন (ও সপত্নী পদ্মাবতীর) সাথে মিলিত হলেন।

প্রশ্ন ওঠে, প্রবল পরাক্রান্ত মহাসেন প্রদ্যোৎকে ছেড়ে উদয়নকে কেন মগধরাজ দর্শকের সাহায্য নিতে হল স্বরাজ্য ফিরে পেতে। এর কোন ইঙ্গিত স্বপ্ন-বাসবদত্তা-তে নেই। হয়ত উদয়নের ব্যবহারে প্রদ্যোৎ বিরক্ত হয়েছিলেন যদিও বাসবদত্তা স্বেচ্ছায় উদয়নের সঙ্গে গিয়েছিলেন বলে সরাসরি জামাইকে শাসন করেন নি। মনুসংহিতা ও পুরাণে যে আটরকমের বিবাহের কথা আছে তাতে উদয়ন-বাসবদত্তার বিবাহকে গান্ধর্ববিবাহ বলে ধরা যায়। সমাজস্বীকৃতি পেলেও প্রদ্যোৎ এ বিবাহে নিশ্চয়ই আনন্দিত হন নি।

কালিদাসের চেয়েও ভাসের জীবন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কম। ভাস বোধহয় কালিদাসের শতেক বছরের অগ্রণী। তাঁর স্থিতি খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী - এই সাতশ বছরের বিভিন্ন সময়ে ধরা হয়েছে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতে। আমাদের অবশ্য সে বিচারে যাবার প্রয়োজন নেই। প্রায় দুহাজার বছর আগের লেখা এই নাটকটি আজও পড়তে ভাল লাগে। ছোটখাট ইঙ্গিতে ভাস নাটকের বিভিন্ন চরিত্রকে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, শক্তিশালী লেখকের পক্ষেই তা সম্ভব।

সাহিত্যরস ছাড়াও তৎকালীন হিন্দুসভ্যতার নানা রূপ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে জড়িয়ে আছে স্বপ্নবাসবদত্তার প্রতি অঙ্কে। এই প্রাচীন নাট্যকারের লেখা আমাদের পুরনো ঐতিহ্যের অনেক কাছাকাছি এনে দেয়। নাম ছাড়া ভাসের অস্তিত্বের অন্য কোন প্রামাণ্য তথ্য আমাদের কাছে নেই। তাঁর অপূর্ব রচনার মধ্যে তিনি কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ অমর হয়ে আছেন - আর কোন পরিচয় বুঝি অপ্রয়োজন।

# তারাসুন্দরী

রেখা মিত্র

আজ আমার ছোট পিসির কথা বলবো। বাবারা পাঁচ ভাই ও তিন বোন। বাবা, ভাইদের মধ্যে ছোট, তার পরে ছোটপিসি তারাসুন্দরী। বাবা গ্রামের স্কুলে সংস্কৃত পড়ান আর কয়েক ঘর যজমান আছে তাদের পূজো করেন। মোটামুটি সচ্ছল পরিবার আমাদের। পুরোনো আমলের বড়ো বাড়ীতে আমরা থাকি। জ্যাঠারা সকলে এদিক ওদিক চলে গেছেন, মাঝেমাঝে আসেন এক আধদিনের জন্যে। অন্য পিসিদের আমি দেখিনি। ছোটপিসির বিয়ে হয়েছে কাছের এক মফস্বল শহরে। তখনও আমার জন্ম হয়নি।

বাবা ও মায়ের সঙ্গে ছোটপিসির খুব ভাব। বাবা মাসে একবার করে পিসেকে দেখে আসেন। ছোটবেলায় মনে পড়ে পিসি এসে কয়েকদিন করে থাকতেন। বেশীদিন থাকতে পারতেন না, বাড়ীর ছোটবৌ শ্বশুর শ্বাশুড়ীর খুব আদরের। হবে নাই বা কেন ? দেখতে সুন্দর, স্বভাব সুন্দর, আর খুব কাজের ছিলেন। পাড়ার লোকের কাঁথা সেলাই, আল্পনা দেওয়া, তত্ত্ব সাজানো, কনে সাজানো সবেতেই ছোটপিসি। এখন বড় হয়ে বুঝি পিসেকে ছেড়ে থাকতেও কষ্ট হতো, দুজনের মধ্যে গভীর ভালোবাসা ছিলো।

পিসির কোন ছেলেপুলে ছিলোনা। বেশ কয়েকটা হয়েছিলো কিন্তু বাঁচেনি। আমাদের খুব ভালোবাসতেন। পিসেমশাইয়ের শরীর খুব ভালো ছিলো না। যাইহোক আমার যখন দশবছর বয়স তখন পিসেমশাই মারা যান। শুনেছি মারা যাবার কিছুদিন আগে বাবা যখন দেখা করতে গিয়েছিলেন, তখন ওঁর দাদাদের সামনে উনি বাবাকে বলেছিলেন, " ছোট্দা, আমি চলে গেলে তারাকে আপনার কাছে নিয়ে যাবেন। এ বাড়ীতে ও থাকতে পারবে না।"

ওদিকের সব ঠিক করে পিসিকে বাবা দুমাস পরে নিয়ে এলেন। বাড়ীতে ঢুকে মাকে জড়িয়ে ধরে পিসির কি কান্না। আমরা সকলেই কাঁদছি। পিসি এলো গরুর গাড়ীতে কিছু বাসনপত্র, আর একটা লোহার ট্রাঙ্ক নিয়ে। জায়েরা নাকি ভাগাভাগি করে ঐ সব দিয়েছে। পিসিকে সকলে ভালোবাসে জায়েদের সেটা ভালো লাগতো না। শ্বাশুড়ী মারা যাবার পর জায়েরা ব্যাবহারও ভালো করতো না। সেই সব ভেবেই বোধ হয় পিসের মনে হয়েছিলো পিসি আমাদের কাছে ভালো থাকবে।

পিসির বয়সও বেশী নয়, আমাদের কাছে এসে মায়ের সঙ্গে সংসারের কাজ করতো, রাত্রে পিসির কাছে শুয়ে আমি গল্পো শুনতুম। মাঝে মাঝে মনে হত সবের মধ্যে থেকেও যেন পিসি কিছুর মধ্যেই নেই। বছর খানেক কাটার পর পিসি কাশীতে গিয়ে থাকতে চাইলো। বাবার খুব ইচ্ছে ছিলো না, তবু ওখানে গিয়ে যদি মন ভালো হয় সেই ভেবে রাজী হলেন। ওপাড়ার রায়বাবুর মা কাশীতে থাকেন সেই বাড়ীতেই ঘরের ব্যবস্থা করে, নিজে গিয়ে রেখে এলেন। যাবার আগে পিসি মাকে বললো "বৌদি বড় ভালো ছিলুম

তোমাদের কাছে। শেষের ক'বছর শাশুড়ী আর স্বামীর সেবা করে কেটেছে। একে একে দুজন ভালোবাসার লোক চলে গেলো, বড় ফাঁকা হয়ে গেলো জীবনটা। নিজের ছেলেমেয়েদের রাখতে পারিনি, জায়েরা ওদের ছেলেমেয়েদের কাছে আসতে দিতো না। এখানে এসে ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমার মন ভরে গেছে। বড় মায়ায় জড়াচ্ছি, একটু দূরে যাই। যদি ভালো না লাগে চলে আসবো। তোমরা আশীর্বাদ করো বাবা বিশ্বনাথ যেন পায়ে ঠাঁই দেন।"

ক'দিন বাদে খুব মন খারাপ নিয়ে বাবা বাড়ী ফিরলেন। আমাদের সকলেরই মন খারাপ। রাতে শুয়ে পিসির কথা ভাবি। বাবা প্রতি মাসে টাকা পাঠান। প্রতি সপ্তাহে পিসির চিঠি আসে, ওখানের সব খবর তাতে থাকে, সকলেই ঐ চিঠির আশায় থাকি। যাবার আগে মাকে বলে গিয়েছিল ঐ ট্রাঙ্কে ওঁর ব্যবহারের কিছু জিনিষ রেখে গেলুম, মাঝে মাঝে ক'টা ন্যাপথলিন ঢুকিয়ে দিও, নয়তো সব পোকায় কাটবে। মাও তিনমাস অন্তর ডালা খুলে তাই করে। ওপর থেকে দেখা যায় একটা ধুতি দিয়ে সবটা ঢাকা। ওটা সিঁড়ির তলায় এক কোণে ঢোকানো থাকে।

বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে, এক সাধুর কাছে দীক্ষা নেবে বলে বাবার অনুমতি চেয়ে পিসির চিঠি এলো। বাবা অনুমতি দিয়ে উত্তর দিলেন। এদিকে রায়বাবুর মা জানালেন তারা এক ভণ্ড সাধুর পাল্লায় পড়েছে। বাবা খুবই চিন্তিত। মা বললো তারা খারাপ কিছু করার মেয়ে নয়, তবু তোমার যখন চিন্তা হচ্ছে, অনেকদিন বোনকে দেখোনি একবার বরং দেখে এসো। পিসি লিখলেন খুব ভালো হবে, চলে এসো সাধুবাবার সঙ্গে তোমারও দেখা হবে।

বাবা ফিরে এসে বললেন - গঙ্গার ধারে নিজের জপ ধ্যান নিয়ে এক সাধু থাকেন। কারোর সঙ্গে প্রায় কথা বলেন না। গঙ্গায় চান করে যাবার সময় কেউ ফল কেউ মিষ্টি বা পয়সা দিয়ে যায়। নিজের সেদিনের মত যা লাগবে রেখে আর সব বিলিয়ে দেন। একদিন কি মনে হতে পিসি নিজের কথা সব বলে উপদেশ চান। উনি বলেন তোর তো মা আর বেশীদিন ভোগ নেই, নামজপে সময় কাটিয়ে দে, তোর ভালো হবে। দাদার অনুমতি পেয়ে ওঁর কাছে নাম নিয়েছেন, শিখে নিয়েছেন কিভাবে জপ ধ্যান করতে হবে, তাই করে বেশ খুশী আছেন। সাধুবাবার অনুমতি নিয়ে, নিজের জন্যে যা রান্না করেন তাই থেকে সাধুবাবাকে দিয়ে আসেন দুপুরে, আর বিকেলে খানিকটা ক্ষীর দেন। সারাদিন নাম জপে কাটান। রায়বাবুর মায়ের সঙ্গে গল্পো করা বা এদিকওদিক বেড়ানো বন্ধ করেছেন, তাই ঐ অভিযোগ।

এইভাবে বছর চারেক কেটে গেছে। পোনের বছরের মেয়ে আমি। বিয়ের জন্যে মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। পিসির চিঠি এলো, দাদা বাড়ী যাব আমায় নিয়ে যাও। আমরা মহাখুশী, বাবা পরদিনই রওনা হলেন। সাধুবাবার সঙ্গে দেখা হতে তিনি বাবাকে বললেন - বোনকে বাড়ী নিয়ে যাও, ওর এই শরীর ধারণের কাল আর বেশীদিন নেই। এখানে থাকার দরকার নেই, বরং বাড়ী গিয়ে ওর কতগুলো ইচ্ছে পূরণ করার আছে, সেগুলির ব্যবস্থা করুক।

পিসি যে বাড়ীতে ছিলো, তার তিনটে ঘরে দুজন করে পিসির মত মহিলা তাদের ছোট সংসার নিয়ে ভাড়া থাকতো। যার বাড়ী তিনি ছোট ছেলে নিয়ে বিধবা হন। কষ্ট করে এখন তার ছেলে সবে ডাক্তার

হয়ে বেরিয়েছে। সেই নিজের মায়ের মত করে অন্য মহিলাদেরও দেখাশুনো করতো। পিসির কাছে আমার কথা শুনে, ওঁরা দুজনও এসেছেন, বাবা ও পিসির সঙ্গে। দুজন বাড়তি লোক দেখে আমরা অবাক। আমি পিসিকে পেয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে জড়িয়ে পিসিকে অস্থির করে তুলছি, পিসিও হাসিমুখে সব সইছে। মা অতিথিদের যথাসম্ভব আদর যত্ন করল। পাঁচদিন বাদে তারা ফিরে গেলেন। পরে শুনলুম দুমাস বাদে ঐ ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে। চলে যাবার পর আর একটা ঘটনার কথা পিসি বললো। ওরা যেদিন রাতে চলে আসবে, সেদিন ভোরে সাধুবাবার কাছে বাবা দীক্ষা নেন। প্রনাম করে চলে আসবেন সেই সময় এক মাড়োয়াড়ী হন্তদন্ত হয়ে এসে সাধুবাবার পায়ের কাছে একটা প্যাকেট, একটা বড় হাঁড়ি মিষ্টি, ও একশো টাকা নামিয়ে রেখে হাতজোড় করে বললেন - অনেক কষ্টের পর নাতি হয়েছে। কাল স্বপ্নে দেখেছি ঐ জিনিষ আপনাকে দিতে হবে, তার সঙ্গে নাতি হবার জন্যে মিষ্টি ও প্রনামী। সাধুবাবা প্যাকেট না খুলেই বললেন, প্যাকেট আর মিষ্টি থাক, আর ঐ টাকা দিয়ে কিছু দুঃখীকে খাইয়ে দিন। ভদ্রলোক খুসীমনে সেই ব্যবস্থা করতে চলে গেলেন। সাধুবাবা পিসিকে ঐ প্যাকেট দেখিয়ে বললেন ওটাতে তোমার ইচ্ছেপূরনের জিনিষ আছে, দেশের বাড়ীতে গিয়ে দেখো। আর ঐ মিষ্টিও দেশে নিয়ে যাও। পিসি দু-একটা ওঁর জন্যে রাখতে চাইলে উনি বলেন - মা এই চারবছর ধরে তুমি আমার সেবা করেছো, যখন যা ইচ্ছে হয়েছে বলেছি তুমি তা যথাসাধ্য পূরন করেছো, আমার আর কোন বাসনা নেই, তুমি ঐসব নিয়ে খুসী মনে বাড়ী গিয়ে তোমার কাজ সেরে ফেলো। এবার সেই প্যাকেট খুলে বেরোল একটা সুন্দর লাল বেনারসী ও একজোড়া জোড়। আমরা অবাক। পিসির চোখে জল, মুখে হাসি, বললো খুব ইচ্ছে হয়েছিলো মালতীর ( আমার নাম ) বিয়ের বেনারসী আর বরের জোড় ওখান থেকে কিনে আনবো। দাদাকে তো বেশী টাকা নিয়ে যেতে বলিনি, তাই সে ইচ্ছে প্রকাশ করিনি। সাধুবাবার উদ্দেশ্যে প্রনাম জানিয়ে বললো বাবা মনের কথা বুঝে ইচ্ছেপূরন করেছেন।

পিসির বেশ পরিবর্তন হয়েছে। কখন ওঠেন জানিনা, ছাতের এক কোনে বসে বেশ বেলা পর্যন্ত ধ্যান করেন। সব কাজের মধ্যেও মন যে ওঁর জপে ব্যস্ত তা বোঝা যায়। মা ও বাবার চিন্তা দুমাসের মধ্যে বিয়ের গয়নাগাটী, খরচপত্র কিভাবে যোগাড় হবে। পিসি বললো ওতো আমারো মেয়ে, আমি ওকে রানীর মত সাজিয়ে বিয়ে দেবো। তোমরা কিছু ভেবো না, সব খরচ আমার। বাবা বললেন, তুইকি পাগল হয়েছিস ? তুই কোথায় পাবি ? পিসি হাসলো। রাতে সব কাজ মিটলে, সিঁড়ির তলা থেকে পিসির ট্রাঙ্ক টেনে বার করা হল। কয়েকটা তেলাপোকা এদিক ওদিক ছুটে পালালো। তাতে কি আছে আমরা জানিনা। কৌতূহল নিয়ে আমরা পিসিকে ঘিরে বসেছি। খোলা হলে বের হল পিসের খড়ম, শাল, ধুতি, কয়েকটা জামা, পিসের মোক্তারী করার একটা কোট, আর বেগুনী, হলুদ, নীল তিনটে বেনারসী। বললো তোর যেটা পছন্দ রাখ, অন্য দুটো দুই ছেলের বৌয়ের জন্যে থাকবে। একটা কাঁচি আনতো মা। এনে দিলুম। কাঁচি দিয়ে কোটের পকেটের আর কলারের ভেতরের দিকের সেলাই কেটে প্রায় দশভরির এক বিছেহার আর তিরিশটা মোহর বের করলো। আমরা হতবাক হয়ে দেখছি, অবহেলায় সিঁড়ির তলায় পিসি ঐ সম্পদ রেখে গিয়েছিলো। বললো শ্বাশুড়ী লুকিয়ে ঐ হার দিয়েছিলো, আর পিসে একটা একটা করে মোহর এনে বলেছিলেন যে করে হোক লুকিয়ে রাখতে, অসময়ে কাজে লাগবে। আমাদের তো ধারনা ছিলো পিসে কিছু রেখে যেতে পারেননি। পিসির বিয়ের গয়নাপত্রও পিসের অসুখে খরচ হয়ে গেছে। সবার নীচ থেকে বেরোল ছোট ছোট ছেঁড়া কাপড়ের পুটলি, মরচে পড়া ছুঁচ, নানা রংয়ের রঙ্গীন সূতো, পিসির বিয়ের বালা, বাজু, সীতাহার, কানবালা, পায়ের মল। সব মায়ের হাতে দিয়ে বললো এগুলো ভেঙ্গে ওর পছন্দ

মত সব গড়িয়ে দাও। পিসি হাসছে, আমাদের সকলেরই চোখ ছলছল করছে। আমি বললুম তোমার গয়না ভাঙ্গতে হবে না। পিসি বললো ওগুলো পুরোনো প্যাটার্ন, তাছাড়া আমার মত কপাল হোক তা চাইনা। বললুম আশীর্বাদ করো তোমার মত যেন মনটা হয়, তোমার মত যেন সবসময় হাসিখুসি থাকতে পারি। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে একজন আগে যাবে, কার কখন সময় আসবে কেউ কি বলতে পারে ? কপালে যা আছে হবে। পিসি বললো বেশ তাই হবে। ঐ বড় হারটা ভেঙ্গে ছেলের বোতাম আংটি আর দুএকটা গয়না তোর জন্যে, আর দুই বৌ আসবে তাদের জন্যে দুটো হার গড়াতে হবে। আজ আমি মুক্ত। সাধুবাবা বলেছিলেন বাড়ী গিয়ে লুকোন ধনের ব্যবস্থা করিস। শেষে মরে কি যক্ষী হয়ে ধন পাহারা দিবি ? জানিনা উনি কি করে জেনেছিলেন।

দিন দশেক বাদে আমার ভাবী শ্বাশুড়ী মায়ের চিঠি এলো - পিসি যে রাত্রে চলে আসে তারপর দিন ভোরে সাধুবাবা ধ্যানের মধ্যেই দেহ রেখেছেন। কাঁদতে কাঁদতে পিসি বললো চোখের সামনে বাবার দেহত্যাগ সহ্য করতে পারবো না বলে বাবা আমায় সরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। তারপর থেকে পিসির ধ্যান জপের সময় আরো বেড়ে গেলো। আরো বেশী করে সংসার থেকে নিজেকে গুটিয়ে ফেলতে লাগলো।

আমার বিয়ের পর কাশী চলে গেলুম। আমাকে পেয়ে শ্বাশুড়ী খুব খুসী। আত্মীয়দের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে, শেষে ছোট ছেলে নিয়ে একলা কাশীতে এসে, তাকে মানুষ করে, বিয়ে দিয়ে ঘরে বৌ এনেছেন। তাই আনন্দ হবারই কথা। এদিকে ছ'মাস হয়ে গেল, বাড়ীর জন্যে খুব মন কেমন করছে। শ্বাশুড়ীমাকে বলাতে উনি ছেলে দিয়ে আমার বাপের বাড়ী যাবার ব্যবস্থা করলেন। ঠিক হল ও আমাকে পৌঁছে দিয়ে চলে যাবে আবার মাসখানেক বাদে এসে নিয়ে যাবে। আমাদের দুজনকে পেয়ে সকলে ভীষন খুসী। পিসি ও মা আমার কাছে খুঁটিয়ে জানতে চায় আমাদের সংসারের কথা। আসলে চিন্তা মেয়ে সংসারে মানাতে পারছে কিনা, সুখী কিনা। সব শুনে যখন বুঝলো আমি সুখী, ওরা নিশ্চিন্ত হল।

একমাস হাসি গল্প হৈহৈ আনন্দে কেটে গেল। দুদিন হলো উনি এসেছেন আমায় ফিরিয়ে নিতে। রাত্রে পিসি বাবাকে একটা ফর্দ দিয়ে বললো বাজার থেকে এগুলো কিনে এনো। আমি নিজে কাল সকলকে রান্না করে খাওয়াবো। শুক্তো, চচ্চড়ি, ঘন্ট, কৈমাছের পাতুরী, পুকুর থেকে ধরা বড় কাত্‌লা মাছের মুড়ীঘন্ট, ভাজা, কালিয়া, চাট্‌নি, পায়েস আরো কত কি। জামাই আসবে বলে পিঠে, নাড়ু, তক্তি, মোয়া, নারকোলের চিঁড়ে, জিরে আরও কত রকম মিষ্টি তো আগেই করেছে। দাদা, জামাই ও ভাইপোদের সামনে বসে যত্ন করে খাওয়ালো। আমাদের কোন আপত্তি না শুনে, মাকে ও আমাকেও যত্ন করে খাইয়ে তবে নিজে খেলো। পরেরদিন অনেকবেলা হয়েছে পিসি তখনও পূজো শেষ করে ছাত থেকে নামছেনা দেখে মা দেখতে গেলো। মায়ের চীৎকার করে কান্না শুনে সকলে দৌড়ে ছাতে গিয়ে দেখি পিসির প্রানহীন দেহ পড়ে আছে। হাতে জপের মালা, মুখটা হাসিমাখা। যেন ইষ্টের কোলে শুয়ে আছেন। আমরা সকলেই ডুকরে ডুকরে কাঁদছি। কোন কষ্ট না পেয়ে, সব ইচ্ছে মিটিয়ে, কাউকে কিছু না বলে, পিসি আমার চুপিচুপি চলে গেলেন অমৃতধামে।

# অতীতের কথা

কল্পনা দাস

গল্পগুলো ছোটোবেলায় বেশ ভালো লাগতো। কিছু পড়া কিছু শোনা। মাঝে মাঝেই সেগুলো মনের মধ্যে গুনগুন করে এখনো।

বাল্মীকিমুনির রামায়নের গল্প আমরা অনেকেই পড়েছি ও শুনেছি। মুনি হবার আগের ঘটনাটা মনে পড়লো হঠাৎ।

নাম ছিলো তার রত্নাকর। দস্যু রত্নাকর। তার পথে যে পড়তো, তাকে মেরে তার সমস্ত ধন সম্পদ কেড়ে নিতো। এটাই ছিলো তার রোজগার। জীবিকা নির্বাহের পথ। বাবা, মা, স্ত্রী সকলকেই ঐ জীবিকাতে দেখাশুনো করতো। তাতে তার কিছুমাত্র কুণ্ঠা ছিলো না। দস্যু রত্নাকরের অত্যাচারের কথা সকলেই জানতো। কিন্তু ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারতো না।

একদিন নারদমুনি ঐ পথ দিয়ে আসছিলেন। রত্নাকর যথারীতি তাঁকে ধরলো। কিন্তু নারদমুনির তো কোন সম্পদ নেই। দস্যু তাঁকে মেরে ফেলতে গেলো। নারদমুনি খুব চালাক ছিলেন। তিনি বিপদ থেকে বাঁচার পথ খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কিছুই ভেবে উঠতে পারলেন না। শুধু রত্নাকরকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি যে এত অন্যায় করছো,এত লোককে মেরে ফেলছো, তাতে তোমার কত পাপ হচ্ছে। স্বর্গে তো নয়ই নরকেও তোমার স্থান হবে না। কার জন্যে এত পাপ করছো ?" রত্নাকর বললো " সংসার পালনের জন্যে আমি এইকাজ করছি। বাবা, মা, স্ত্রীকে দেখাশুনো করছি। তারা আমার সবেরই ভাগ নেবে।" নারদমুনি বললেন " ঠিক আছে আমায় বেঁধে রেখে যাও। বাড়ীতে গিয়ে জেনে এসো তোমার পাপের ভাগ কে কতটা নেবে।"

দস্যু রত্নাকর প্রথমে স্ত্রীর কাছে গেল। ভাবল সহধর্মিনীরও নিশ্চয়ই সংসারের দায়িত্ব আছে। স্ত্রীকে বলল নারদমুনির কথা, সে কতটা পাপের ভাগ নেবে। স্ত্রী সব শুনে বলল, "দেখ ধর্ম সাক্ষী করে তুমি আমাকে বিয়ে করে এনেছ, আমার ভরনপোষনের সমস্ত দায়িত্ব নেবে এই প্রতিজ্ঞা করেছ। আমি তোমার সেবা করব, সেটা আমার কর্তব্য। তুমি কিভাবে আমার ভরনপোষন করবে তা আমার জানার দরকার নেই। আমি তো তোমার পাপের ভাগী হতে পারি না।"

রত্নাকর ভীষন ক্ষেপে গেল স্ত্রীর ওপর। সেখান থেকে গেল বাবামার কাছে। ভাবল, তাঁরা তো সন্তানকে একথা বলবেন না। দস্যু রত্নাকর একই ভাবে বাবামাকে নারদমুনির কথা বলে ছেলের পাপের ভাগ কে

কতটা নেবে জিজ্ঞেস করল। বাবামা সব শুনে বললেন "তোমাকে আমরা জন্ম দিয়েছি, লালনপালন করে বড় করেছি। সেই ছিল আমাদের কর্তব্য। এখন আমরা বৃদ্ধ হয়েছি, সন্তানের কর্তব্য বৃদ্ধ বাবামাকে দেখাশোনা করা। তুমি যা করবে তার পাপপূন্যের ভাগ সবটাই তোমার। আমরা তো তোমার পাপের ভাগ নিতে পারি না। তখন রত্নাকরের দিব্যচক্ষু খুলল, দৌড়ে এসে কেঁদে পড়ল নারদমুনির কাছে।

বিদ্যাসাগরের কাছে গ্রামের এক বিধবা তার ছেলেকে নিয়ে এসে কেঁদে পড়ল। বলল, "বাবা, আমার ছেলেটা তোমার খুব ভক্ত, তোমার কথা সবসময় বলে। ও মাঝেমাঝে রসগোল্লা খেতে চায়, বায়না ধরে। আমি গরীব বিধবা, লোকের বাড়ী কাজ করে সংসার চালাই, কি করে ওকে রসগোল্লা খাওয়াই ? তুমি ওকে বুঝিয়ে বল রসগোল্লা খাবার জন্যে কান্নাকাটি না করতে।" বিদ্যাসাগর একটু হতভম্ব ও বিমর্ষ মুখে বললেন মহিলাটিকে, "তুমি তেমার ছেলেটিকে নিয়ে একমাস পরে এস, তখন ওকে ঠিক করে বলে দেব।"

একমাস পরে বিধবা তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে এসে দাঁড়াল। বিদ্যাসাগর ছেলেটিকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "বাবা তুমি রসগোল্লা খাওয়ার জন্যে কান্নাকাটি কোরো না, তোমার মায়ের খুব কষ্ট হয়।" ছেলেটি কি বুঝলো, মাথা নেড়ে সেখান থেকে চলে গেলো।

ঘরে বিদ্যাসাগরের একবন্ধু ছিলেন, তিনি সব শুনেছিলেন। তিনি বললেন "তুমি শুধু ঐ কথা বলে ছেলেটিকে ছেড়ে দিলে ?"

বিদ্যাসাগর করুন মুখ করে বন্ধুটিকে বললেন, "আমি তো রোজ রসগোল্লা খেতাম। এই একমাস ধরে রসগোল্লা না খেয়ে থাকার চেষ্টা করলাম। ঐ ছাড়া আর কি বলবো ?"

# স্মৃতির বুদ্‌বুদ্‌

শম্ভুনাথ সেন (কলকাতা)

১৯৩৭ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের Intermediate Science ক্লাসে একটা ঘটনার কথা মনে এল। আমার এক classmate, বেশ লম্বা, প্রায়ই অন্যমনস্কভাবে ডানদিকের থুতনীর আঁচিলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতো। একদিন লেখার সময় হঠাৎ আমার কলমটা চাইলো - তারপর লিখতে লিখতে বললো -
'কলমটা তো বেশ ভালো ...'
আমি বললাম - 'এমন কিছু নয়, দেশী "ভারতী" পেন। Regular system, ড্রপার দিয়েই কালি ভরতে হয়। নিব্‌টাও একটু মোটা।'
কিন্তু ছেলেটি আবার লিখে বললো -
'এ তো বেশ ভাল কলম।'
সেদিন ছেলেটি তার কথায় বুঝিয়েছিল যে "Brand" দিয়ে কোনো কিছু বিচার না করে গুণগত মান (quality) দিয়েই তা করা উচিত।
সেই লম্বা ছেলেটিই সত্যজিৎ রায়।

------------

দিলীপ গুপ্তের সিগনেট বুক শপে শুরু থেকেই ওদের প্রকাশিত ছাপা মলাট আমায় দারুণভাবে আকর্ষণ করতো। বই কিনতে গিয়ে দিলীপবাবুর সঙ্গে আলাপও হয়। ওদের প্রকাশিত বইএর সঙ্গে 'টুকরো কথা' এবং বইএর প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণে সত্যজিতের নাম দেখে ভালো লাগতো। পরে নিজের কাজের জন্য সিকিমে ওম্ফায় গিয়ে দেখেছি যে ওদের পুঁথিতে পুঁথিতে বিষয়বস্তু বোঝানো হ'ত মলাটে ছবি এঁকে।

-----------

১৯৬১ সালে আমরা তখন হায়দ্রাবাদে। 'সন্দেশ' পত্রিকা আবার বার করা হচ্ছে জেনে মেয়ে জুলুকে গ্রাহক করে দিই যাতে বাংলাভাষার চর্চা থাকে কারণ ওখানকার কোনো স্কুলে বাংলা পড়ানো হ'ত না। পরে কলকাতায় ফিরে এসে একদিন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাই মেয়েকে নিয়ে তার লেক টেম্পল রোডের বাড়ীতে। তখন হাত পাকাবার আসরে জুলুর একটা লেখা বেরিয়েছিল 'ভাগ্যনগরী হায়দ্রাবাদ।' দরজায় কড়া নাড়তেই সত্যজিৎ নিজে দরজা খুলে সাদরে ভেতরে নিয়ে বসালেন। জুলুর সঙ্গে হায়দ্রাবাদ সম্পর্কে কথাবার্তা বললেন। আমি Rollie Flex cameraএ ওঁর দুটো ছবিও তুলেছিলাম। ওঁর অমায়িক ব্যবহার আমাদের খুব ভাল লেগেছিল।

------------

১৯৬৯ সালে উড়িষ্যায় ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে ময়ুরভঞ্জের সিমলিপাল পাহাড়ে গিয়েছিলাম। সেখানে বন্যজন্তু ও স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে আমরা ছিলাম। দেশলাই কিনতেও যেতে হ'ত ৪৫ মাইল দূরে। সবুজের সমারোহ, ঝর্ণা ও শান্ত প্রকৃতির রূপ দেখে আমি মুগ্ধ। ওখান থেকে দূরে পশ্চিমে টৌডারী মাইন এবং express highway দেখা যায়। উত্তরে দলমা পাহাড়, তারই কাছে Jamshedpur । মনে পড়ে গেল প্রমথনাথ বসুর কথা।

তিনিই ছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক যিনি বিলেত থেকেই appointment letter নিয়ে আসেন। ভারতের নানা জায়গায় এমনকি বর্মাতেও তিনি অনেক জায়গায় ঘোরেন। তাঁর স্ত্রী কমলাদেবী (যাঁর নামে কমলা গার্লস স্কুল) সে

যুগে ওঁর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতেন। কমলাদেবী ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত (ICS) এর কন্যা। বিভাগীয় অবিচারে প্রমথনাথ বসুকে Director না করে junior সাহেব ভূতাত্ত্বিককে Director করা হয় এবং এরই প্রতিবাদে প্রমথনাথ বসু ভারতসরকারের চাকরী থেকে ইস্তফা দেন। পরে ময়ুরভঞ্জের মহারাজা তাঁকে State Geologistএর পদমর্য্যাদা দেন। এই সময় উনি বোনাই এর iron ore দেখে জমসেদ্‌জী টাটাকে চিঠি দেন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় Tata Iron & Steel Co মধ্যপ্রদেশে না হয়ে জামসেদপুরে হয়। প্রমথনাথ অবসর গ্রহণের পরও দেশের এবং দশের কথা ভেবে অনেক ভাল কাজ করে গেছেন। কুটির শিল্পের প্রসার এবং সমবায় প্রথার জন্য ওঁর চেষ্টা ছিল আন্তরিক। তাঁর মৃত্যুতে রাঁচি বন্ধ পালিত হয় এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলে তাঁর শেষ যাত্রায় অনুগামী হয়েছিলেন।

সিমলিপালে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে 'রবীন্দ্রনাথ' এর উপর যেমন তথ্যচিত্র তৈরী হয়েছে প্রমথনাথ বসু সম্পর্কে সেইরকম একটা 'তথ্যচিত্র' করা যায় কিনা। ভূতাত্ত্বিক বন্ধু সংকর্ষণ রায়কে নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়ীতে যাই। সেবারও সত্যজিৎ আমাদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে প্রমথনাথ বসুর কথা শোনেন। ছবি করার প্রস্তাব শুনে তিনি জানতে চান আমরা State Govt. এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি কিনা এবং State Govt. এ ব্যাপারে finance করতে আগ্রহী কিনা। তখন কোনো Film Finance Institute তৈরী হয়নি এবং এ সম্পর্কে আমরা আর এগোতে পারিনি।

------------

১৯শে এপ্রিল ১৯৯২। South Bengal State Transportএর বাসে আমি যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি বাসে সত্যজিৎ। আমি তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিগেস করলাম, 'তুমি! তিনমাস Bellvueতে ছিলে! এখন এ ভাবে কোথায় যাচ্ছো?'
সত্যজিৎ জানালো - 'সে দারুণ ডাক্তার! সব ঠিক করে দিয়েছে। বাড়ী যাচ্ছি।'
জানতে চাইলাম - 'বাড়ী মানে, বিশপ লেফ্রয় রোডএ? সঙ্গে কেউ নেই? আমি কি সঙ্গে যাবো?'
- 'না দরকার নেই।' তারপর চোখ টিপে বললো - 'Surprise দিতে যাচ্ছি।'

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। বুঝলাম সবটাই স্বপ্ন! বড়মেয়ে বুলুকে বললাম নন্দন থেকে প্রকাশিত সত্যজিৎ রায়ের সত্তর বছর পূর্তির বইটা সংগ্রহ করতে।

২৪শে এপ্রিল বইটা যখন আমার হাতে দিল তাতে লেখা -

> বাবা -
> ঠিক তখনই* হয়তো বইটা নিচ্ছিলাম নন্দন থেকে যখন ...
>
> - বুলু

*২৩শে এপ্রিল '৯২
বিকেল ৫:৪৫ মি:

(এই লেখাটি সম্প্রতি 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। শ্রী শম্ভুনাথ সেন ১৯৮৭ সালে আট্‌লান্টায় আসেন তাঁর ছেলে অমিতাভ'র কাছে বেড়াতে - তখন আট্‌লান্টার অনেক বাঙালীদের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয়েছে। এখন তিনি কলকাতা'য় কলেজ স্ট্রীটে থাকেন।)

# কলকাতার চিঠি

অসীমদেব গোস্বামী (কলকাতা)

যদিও হিমালয়, গৌরবে
আছে মাথা তুলে,
এরই পাদমূলে মান-অসম্মান
সমার্থক -
যৌবনের প্রথম মুকুল ঝরে যায়
জীবনের প্রমত্ত তাড়নায়,
অতীতের স্বপ্নসুখ বর্তমানে ফেলে
দীর্ঘশ্বাস।
প্রত্যহের দুর্মদ সংঘাতে
ক্ষত আরও গভীর হয়।
জীবনের প্রত্যুষে যে তরুণ মন
যা-কিছু সুন্দর তাকেই করেছিল আবাহন,
আজ বিষণ্ন সন্ধ্যায় কণামাত্র তার
পায়না খুঁজে!
রাত্রির উৎকণ্ঠায় জন্ম নেয়
দিবসের ভ্রম -
এ এক পরম গ্লানি, মনে হয়
সবই পণ্ডশ্রম
রজনীগন্ধার গুচ্ছ নয়, নিজেরাই পুচ্ছ তুলে নাচানো
অহমিকার ঘেরাটোপে -
অতি সংযতনে ভীরু প্রাণ বাঁচানো।
অতলান্ত সাগরতীরে যে ছিল দিশারী -
সেই বন্ধু আমার আজও পাঠায় বাঁচার আশ্বাস।
দিবসের স্বচ্ছতায় যারা ভীড় করে ছিল -
তারা সব কোথায় এখন?
হে রাত্রি, তুমি আমাকে ঘিরে থাক।।

# কলকাতার স্মৃতি

প্রণব কুমার লাহিড়ী

মাঝে মাঝে ছোট ছোট ছবি ভেসে আসে
অনেককাল আগেকার ফেলে-আসা কলকাতা শহরের।
ভোর বেলা কাক-চিল ওঠারও অনেক আগে
টালিগঞ্জ থেকে প্রথম ট্রাম আসতো
চোখে ঘুম-ভরা গুটিকতক যাত্রী নিয়ে।
অনেক পরে এক এক করে দোকানগুলি খুলতো।
তখন মনিহারী দোকানের গোপালবাবু দরজা খুলে,
ঝাঁট দিয়ে, জল ছিটিয়ে, দেয়ালে রাখা সিদ্ধিদাতা
গণেশকে চোখ বুঁজে প্রণাম করতেন। তারপর
খদ্দেরদের দেখাশুনা আরম্ভ হ'তো ... প্রথম সওদার
টাকাটা মাথায় ঠেকিয়ে বাক্সে তুলে রাখতেন।
একে একে থলি হাতে আপিসের বাবুরা
আসতেন বাজারে। সেই সঙ্গে আনন্দবাজার হাতে
আলোচনা হত এক আধটু রাজনীতি আর ফুটবলের।
কিন্তু বড় তাড়া - তাই আসর জমার আগেই ছুটতে হতো। ...
ভাত খেয়ে আপিসের পথে ট্রামে বসে দুলুনির আমেজে
চোখ বন্ধ হয়ে যেতো। কিন্তু কি আশ্চর্য্য - যেই
আপিসের কাছে ট্রাম এলো মুহূর্ত্তে শেষ হতো ঘুম
আর বাবু নিমেষে নেমে পড়তেন লাফিয়ে। ...
তিনটে-ছটা-নটায় ছবিঘরের কাছে কি ভীড়।
তারই মধ্যে সুবেশ দম্পতি গা বাঁচিয়ে ঢুকলেন
শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে - কি আরাম! বিরামের
সময় পাবেন সোডা লেমনেড অথবা আইস্‌ক্রীম।
কি ঠাণ্ডা আর কি মিষ্টি।
শীতের রাত্রে শাস্ত্রীয় সংগীতের সম্মেলন চলছে।
আপনার টিকিট নেই? তাতে কি! রাস্তায় মাদুর
পেতে বসে যান সবার সাথে। শুনুন
আমীর খাঁ থেকে বিস্‌মিল্লার সৃষ্টি
অপরূপ বেহাগ থেকে ভৈরবী॥

# কলকাতার শ্রাবণ

অমিতাভ সেন

হ্যারিসন্ রোডের মোড়ে
দু-দুটো ট্রাম মুখোমুখি পড়ে আছে
যাত্রীবিহীন
দু-একটা বাস
ভরসা করে চলছে
রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে -
জানলা দিয়ে বেরিয়ে আছে
অনেকগুলো কালো ছাতা।

বৃষ্টি থেমে গেছে বহুক্ষণ,
যদিও শ্রাবণের ঘন কালো মেঘ
সূর্য্যের সাথে তার লুকোচুরি খেলা
কলকাতার এই শুভ্র সকাল বেলা -

ঝপ!
ওই একটা রিক্সা গেল উল্‌টে
ম্যান্‌হোল্‌টা নিশ্চয় খোলাই ছিল!
যা, যা! ধর, ধর!
মোটাসোটা মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী
গড়িয়ে পড়লো জলে -
ভিজে, কাদায় কালো।
ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া রিক্সাওয়ালাকে
কি খিস্তি!

না! আর এক হাঁটু জল ডিঙ্গিয়ে
বাজার করা হ'লনা বাঙ্গালী বাবুর।
আপিস, স্কুল তো সব বন্ধ!
কি হবে আর বাজার ক'রে?
বাড়িতে ভাত-ডাল যা আছে,
খিচুড়িটাই জমবে ভাল -
তবু যদি দুএকটা কাঁচা লঙ্কা পাওয়া যেতো -
পায়ের পাশ দিয়ে ভেসে গেল ডাবের খোলা।

হঠাৎ শোনা গেল, কে গাইছে -
"শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা ..."
বেশ -
আকাশের দিকে তাকাও, দেখ -

বৃষ্টি থেমে গেছে বহুক্ষণ,
যদিও শ্রাবণের ঘন কালো মেঘ
সূর্য্যের সাথে তার লুকোচুরি খেলা
কলকাতার এই শুভ্র সকাল বেলা।।

Drawing: Amitava Sen

# "আমার মা এবং এই বিদেশে"

মোছারাতুল হক আকমল

ঠিক ঠিক এগারোটি বছর
তাহায্যতের নামাজ পড়তেন মা,
ভৈরবী সুরে ফজরের আজান
নামাজ শেষে কি সুরালা সুরে
সুরা হাসর
আর
কোল্লিস্হম মালিক্যাল মূলক,
সুরাটি মা পড়তেন, প্রত্যহ,
তাঁরি নামাজের পাশে, খাটে
ঘুমের ভাণ ধরে শুয়ে থাকা
সুরা গুলি মুখস্ত হয়েছিল আমার।
মা কেঁদে কেঁদে বাবার জন্য
দোয়া করতেন, গত হয়েছেন
আজ কুড়ি বছর হলো তরা মে।
দোয়েলের শিশ্ আর চড়ূই পাখীর
কিচিরমিচিরে
ঘুম থেকে উঠতাম
অথবা মা'র ডাকে।
সকালে উঠেই শিউলি ফুল কুড়াতাম
মালা গাঁথার আগেই নাস্তা তৈরী।
কার জন্য মালা গাঁথতাম মনে নেই
আজ।
ছিঁটা রুটি, ডিম মাম্‌লেট
অথবা চিতল পিঠা, পনীর দিয়ে,
আর দুফোটা ঘি এর লেপ দেয়া
অথবা মাঝে মধ্যে বৃষ্টির দিনে খিচূড়ী
ঝাল গরুর গোস্ত দিয়ে।
চা'এর সঙ্গে পনীরও চলতো বেশ।
দশটা না বাজতেই
কমলা অথবা মুড়ি বানানো
পিঁয়াজ মরিচ, বিলেতি ধনেপাতা দিয়ে
অথবা কোরবানীর গোস্তের শেষ প্রান্তে
ঝোল দিয়ে মাখানো।
মাঝে মধ্যে বড়ই ভর্তা, আচার
পান্তা ভাত দিয়ে বাসি ডাল
পিঁয়াজ আর শুকনা মরিচ গুড়া
খেয়ে কি রকম ঘুমের ঔষধের
মত নেশা হতো।
নানীর হাতের তিলের নাড়ূ
এখনো জিভে লেগে আছে।
বিকেলে চিড়া ভাজী মুড়ির মোয়া
লোবানী অথবা দুধ-কদু
রাতে দুধ ভাত আম দিয়ে
মাঝে সাঝে সাঁইচা গাছের কাঁঠাল।
তিতাসের তীড়ে পাল তুলা নৌকার বহর
সুর্য্যাস্তের দৃশ্য।
গোল্লাছুট আর দাঁড়িয়াবান্ধা খেলা।
মেহ্‌মান আসার আনন্দ
আপ্যায়ন আর করুণ বিদায়।
বিদায় কথাটা এখনো চোখে
জল এনে দেয়।
নীরবে কত কেঁদেছি।
অতিথির আগমনে ভাল খাবার
কৈ, পাব্‌দা, টাকা মাছ।
টেবিলে আপ্যায়নের কাজ
ন্যস্ত থাকতো আমারই উপর
সেই সুবাদে খাবারে পটূ ছিলাম
তেমনি আপ্যায়নে।
তারপর দীর্ঘ তিনটে বছর
ভার্সিটির করুণ আহার।
এখন আমি বিদেশে
মনে পড়ছে সেই স্মৃতি
মা'কে আমার
আমার আদরের মা'কে
কষ্ট ধৈর্য্য সহ্য করা মা'কে
হাজার প্রণাম জানাই।
মা'কে বোলনা আমি কেমন আছি
শুধু বোল ভাল আছি
বিগত স্মৃতি নিয়ে এই বিদেশে।

# জন্ম

সুস্মিতা মহালানবীশ

জন্ম তোমার কোথায় ? হিংসায় না ভালবাসায় ?
আশায় না হতাশায় ?
দাবানলে জ্বলে যাই
কখনও জ্বলি অজানা অসহ্য যন্ত্রনায়।
হিংসা ঈর্ষার যন্ত্রনা যত
তার থেকেও বড় হয়ে ওঠে ভালবাসার
উদ্দাম উত্তাল তরঙ্গ শত শত।
তাই ভাবি জন্ম তোমার কোথায় ?
হিংসায় না ভালবাসায়
আশায় না হতাশায় ?

Drawing: Mimi Sarkar

# কাল চিন্তন

অর্চনা মুখার্জি কুমার

কতবার মনে মনে এই একই প্রশ্ন করেছি - তোমার চরণে আমার প্রার্থনা পৌঁছেছে কি ? এই চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্যে ব্যাকুল মন একদিন হঠাৎ নিজেই তার উত্তর খুঁজে পেলো।

তোমার মনবীনার প্রতিটি তারের ঝংকারে পাবে সেই অনাহত নাদের আশীর্বাদ বানী। তুমি যখন একবার তাঁর চরণে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পন করেছো তখন আর ভাবনা কি ? এইভাবে নিজেকে হারিয়ে তুমি পাবে প্রার্থনাময় সমর্পনের স্বর্গীয় আনন্দ।

ওই বিরাট প্রানদায়িনী শক্তির মঙ্গলঘটের অমৃতজলের মধ্যে তুমি তোমার প্রার্থনার প্রতিটি শব্দকে খোঁজার চেষ্টা করেছো কি ?

প্রার্থনার অশেষ ক্ষমতা, তবু তোমার মন কেন সেই এক কেন্দ্রবিন্দুর প্রতি স্থির হতে পারছে না ? কেন ক্ষনজীবী মাটির মানুষের কাছে বারবার নিজের শংকা সমাধানের জন্যে যাচ্ছো ? এই ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে কিছু পেলে কি ? উত্তরের আশায় আরো প্রশ্নের জালে জড়িয়ে পড়েছো কি ?

জীবনের প্রত্যেক সমস্যার সমাধানের মধ্যে তাঁর আশীর্বাদকে অনুভব করেছো কি ? অসাধ্য রোগে আক্রান্ত মানুষটিকে আবার নতুন জীবনীশক্তির দ্বারা অনুপ্রানিত হতে দেখেছো কি ? বড় বড় চিকিৎসককে হার মানিয়ে যখন সে নতুন জীবনের পথে পা বাড়াচ্ছে তখন তার মুখের প্রার্থনা আর চোখে অগাধ বিশ্বাসের ঝিলিক দেখেছো কি ?

প্রতেক যুগের মানুষ এই চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর পাবার চেষ্টায় অতীতকে আঁকড়ে, বর্তমানকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে, আগত কালের সূর্যের ঝিলিকের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে হন্যে হয়ে কি বেড়ায়নি ?

দেশ থেকে প্রবাসে, প্রতি মুহূর্তে তাঁর স্নেহের ছোঁয়াকে অনুভব করেছ কি ?

সেই মমতময়ী মায়ের কৃপাসিন্ধুর মাঝে নিজেকে বিন্দুরূপে দেখার চেষ্টা করেছো কি ?

জীবনের প্রতি মুহূর্তের এই সুখ দুঃখ, চাওয়া পাওয়ার মাঝে এই প্রাথনারূপী নৌকোকে আঁকড়ে থাকতে পারবে তো ? যদি সেটা পারো তাহলেই পাবে সেই কালচিন্তনের কালজয়ী প্রশ্নের শেষ উত্তর।

# Ramayana and Durgapuja

An illiterate robber Ratnakar, turned to a poet and a sage, was chosen by the gods to write Ramayana. The word Ramayana means Rama is the way. This immortal epic is about Rama, an incarnation of Lord Vishnu.

Rama's mother was Kaushalya, the oldest of the three queens. Bharata, the son of the youngest queen Kaikeyi was born next. Sumitra gave birth to Lakshmana and Satrughna, the twin brothers. While very young, the blue skinned Rama and brother Lakshmana rid the evil spirits threatening the lives of Viswamitra and other sages and restored the peace and tranquility of their forest hermitages.

Viswamitra arranged the marriages of the four brothers. Soon thereafter, ceremonies began for Rama's coronation. At that time Kaikeyi reminded Dasaratha of the promise he made earlier to give her whatever she wants at a time of her choice. Kaikeyi asked Dasaratha to name her son Bharata as the next king of Ayodhya and banish Rama for fourteen years. Dasaratha was heartbroken but Rama would not let him break his promise and prepared for the exile. Lakshmana and Rama's wife Sita would not let Rama go alone and joined him. Words reached Bharata who was away at that time. He ran and met Rama in the forest and pleaded for his return. Finally, Bharata agreed to rule the kingdom in Rama's absence as his representative by installing Rama's slippers on the throne.

The forests were the natural habitats of the demons. Rama and Lakshmana had to fight with and kill them quite often. Ravana, the king of the demons, planned for revenge. He sent Maricha, one of his assistants, to lure Sita in the disguise of a deer of golden color. As Sita saw the deer, greed overpowered her judgment. She kept on nagging Rama to catch the deer and Rama finally had to give in. He followed the deer leaving Sita under Lakshmana's care.

Rama had to run a great distance before he could shoot the deer. Struck by the arrow, Maricha cried loudly imitating the voice of Rama as if Rama was mortally wounded. Sita got very much upset and forced Lakshmana to go after Rama. Ravana was waiting for such a moment. He abducted Sita and started towards his kingdom in Lanka in his flying chariot that once belonged to Kuvera, the king of theYakshas, who was deposed by Ravana. Hearing Sita cry, Jatayu, an old bird and a friend of Dasaratha, fought valiantly with Ravana to rescue her. Ravana killed him and flew away.

Lakshmana met Rama a little later and the brothers returned to the hut. Seeing no trace of Sita, they started roaming around and met a horde of monkeys. With their help Rama found the whereabouts of Ravana whose kingdom was across the ocean. The monkeys built a stone bridge for Rama to cross with them and fight Ravana.

Many demons got killed in that great war. But Ravana would not give up and Rama found an invincible foe in Ravana. At that time the gods instructed Rama to worship goddess Durga and please her so she would withdraw her

power from Ravana. It was her power which made Ravana so powerful. Rama thus established the tradition of worshipping the mother goddess about this time of the year. According to tradition, offerings to the goddess require 108 blue lotuses. The goddess took away one of the lotuses to test Rama's devotion. Rama decided to offer one of his eyes as he was known as the lotus eyed one. As Rama pointed an arrow towards his right eye the goddess appeared and granted him his wish.

A great fight ensued between Rama and Ravana thereafter. The unprecedented battle was witnessed by the heavenly beings who cheered for Rama as the fatal arrow left his mighty bow and fell Ravana.

The monkey god Hanuman, a great devotee of Rama and Sita, was then instructed to bring Sita from her captivity. She approached Rama with great expectations but was stunned by Rama's harsh and unkind words expressing doubt about her chastity. Sita did not want to live in dishonor and decided to end her life by entering in a blazing fire which she ordered Lakshmana to light.

Fire did not burn Sita. The fire god who knows everything, knew that Sita never entertained impure thoughts. He brought Sita back from the pyre and returned her to Rama who then accepted her. Bibhishana, Ravana's brother, was then installed as the king of Lanka. Then, Rama with his troops, boarded the divine chariot which Ravana took away by force from the king of the yakshas, for the journey back to Ayodhya. Bharata met them at the border and asked Rama to relieve him from his responsibilities and become the rightful king of Ayodhya.

Happiness and peace prevailed in Ayodhya, at least apparently. Slowly but surely, people started to gossip about Sita's character and Rama's weakness in not abandoning her. Words reached Rama who wasted no time in banishing Sita who was pregnant at that time. Lakshmana had the unpleasant duty to leave Sita in the hermitage of Valmiki where Sita gave birth to twin sons Lava and Kusha. The twin brothers grew up to become great warriors and caught the sacrificial horse that was allowed to roam freely for Rama's Ashwamedha ceremony.

The identity of the brothers now became known. Rama then asked Sita to come back to Ayodhya and Sita agreed. But Rama asked again to publicly demonstrate her purity. It was too much for Sita and she asked mother earth to come to her aid. Soon a cavity formed in the ground and mother earth appeared with a throne. She held Sita in her arms and disappeared through that gaping hole as quickly as she came.

Rama ruled the kingdom a few more years. Then a messenger was sent by the gods who reminded Rama that his wordly mission has been accomplished and it was time for him to return to his heavenly abode. Rama then decided to leave his mortal body and joined by his brothers went to the bank of Saraju. One by one they disappeared in the bosom of that holy river.

# Maintaining Cultural Integrity

Lali Watt (Belgium)

I knew before I came to live here that Belgium has two languages - French and Flemish. What I didn't know is to what enormous lengths the system goes to maintain this state of affairs and what impact it has on society.

First of all, Belgium could teach South Africa a thing or two about apartheid. There are **no** mixed neighborhoods - every town, every village, every suburb, every city center is either French or Flemish. Brussels is meant to be the exception to this. As the 'Federal' capital the two societies are meant to co-exist side by side. But don't kid yourself - Brussels is French. Flemish is greeted with snooty condescension and, all too often, incomprehension.

Circumstances and inclination made us choose to live in Flanders when we came here. As a result now, three years later, we know **one** Walloon (as the French speakers are known) family socially. And we only know these people because Ian works in 'multi-lingual' Brussels. The other Walloons he works with, consciously or unconsciously (we hope the latter), don't encourage social interaction whereas many of the Flemish have initiated it. This is in spite of the fact that both of us speak relatively fluent French and precious little Flemish.

The gemeente/commune (depending on whether you're Flemish or Walloon) which is the smallest governmental authority (roughly equivalent to our county or city government) ensures that the 'wrong' people don't live in their jurisdiction. One needs the Mayor's permission to both leave and establish residence in a gemeente. The 'wrong' people include all Moroccan, Turkish and Zairian immigrants and all Flemish or Walloons depending on where you are. And heaven forbid you give your child the 'wrong' name. Each gemeente/commune maintains a list of approved names. When you have a baby you have to pick one of these to ensure there is no mistaking the child's Flemish/Walloon background. If you belong to neither of these communities and want to use an unlisted name you need to produce a letter from your Embassy assuring the authorities that the selected name is an 'approved' one in your country.

Belgians, especially the Flemish, are astute enough to know that speaking their language alone won't get them far given their size. Thus all children

study four languages - Flemish, English, French and German. Further, they don't just study these, they **speak** them. This practice used to be less than universal and it used to be three languages so many older people don't display this dazzling virtuosity. But almost everyone under thirty-five will happily survive in all four and speak at least two fluently. Interestingly, for both language groups, English is the second language as a result of U.S. T.V. programs and movies. Thus, by speaking English, Belgians are part of a vast Anglo-Saxon-based world community. They have come full circle - language divides them internally and language links them externally.

It is an understanding of this dominant role played by language that makes me so afraid when I see the direction we in the U.S. are going. Over the last several years a debate has been raging over the proper role of Spanish. The rising number of Hispanic Americans have decried the 'Anglo' nature of U.S. society as intrinsically unfair. This is, ipso facto, true. Gradually, particularly in the South West, Spanish has become increasingly important not only as a language spoken at home by millions of people, but on street signs, official forms and so on. The rise of Spanish as a 'working,' as opposed to 'domestic,' language alongside English bodes ill for our own cohesiveness as a society in the years to come. Whereas multilingualism and multiculturalism create a more flexible, more valuable individual, the same traits, when applied to a nation, serve to divide and diminish.

## Who would expect?

Jayanti Lahiri

I am writing this on a plane from New York to Atlanta. In this last leg of my trip I was musing about things which, to me, did not seem very ordinary.

Many fly everyday, everywhere. In the flights that I have taken in my life, little things have happened which are too mundane to remember. I somehow felt that my current trip home is one that will surely stay with me for some time.

I will go back to another flight which I remember to this day. After spending some work-related time in New York City, I was flying back to India with my little daughter Lali. Fulbright Foundation bought my ticket for any route I wanted. On our way into New York, we had spent about a week in London. This time therefore I planned on spending a couple of days in Paris, Rome and Athens before flying back to Calcutta. As luck would have it, when all the travel plans were finalized, and I had our tickets in hand, fighting started between the Arabs and the Israelis. Not knowing that this would be the 'Seven Days War' of 1967, I became quite worried and started panicking about our flight back home. Fortunately, the war stopped in time for us to leave. Our tours of Paris, Rome and Athens must have been quite uneventful because I don't have memories, just faint impressions of places like the Versailles Palace, the Vatican, the Colosseum and the Acropolis.

Excitement started when we left Athens for the final leg to Calcutta. Our plane left Athens very late. It was Middle East Airways (I still remember) and the flight was unique for the nature and behavior of passengers. We were to change planes at Beirut and catch a PanAm flight directly to Calcutta. Beirut Airport was closed to all civilian planes until the day before. It was alright with me because we would just change planes.

Alas! that was not to happen. Since we flew in late, we had missed our connecting PanAm flight and would have to stay overnight to take a BOAC flight the next morning. Lali and I surely must not have had visas for Lebanon and they did not issue transit visas at the airport. It was early evening. We were asked to leave our passports with the Immigration Control and were taken in a cab to a hotel in town. Beirut then was a

gorgeous city and I would have thoroughly enjoyed the drive, but for the thought that the flight next morning would leave at the crack of dawn and we would be driven to the airport at the wee hours of the morning. Lebanon is largely French speaking and I had no expertise at that. However I tried to repeat to myself the golden rule 'what cannot be cured has to be endured.'

The hotel however was wonderful and the very familiar voice of Nat King Cole was playing in the lobby. We checked into our room - a beautiful room with a balcony overlooking the waterfront. Lali slept very peacefully and the fear of the unknown kept me completely awake.

About four o'clock the front desk called to say that our cab was waiting. Lali and I hopped in and proceeded towards the airport. The cab driver gleefully hummed an outlandish tune and I in the back seat with Lali trembled with fear in the dark night most worried about the unfounded thought - what would happen if we could not salvage our passports from the immigration! Finally everything worked out fine but I still carry with me the intense feeling of agony of over half a day.

All the above is however a preamble to what happened this time. My journey is not yet over yet and I hope and pray nothing untoward happens in the little bit that is left of it.

My trip to Munich was nothing much to mention except that Munich was extraordinarily hot. After finishing my work there, on my way back I spent four days in Brussels with Lali, her husband Ian and their infant son Rian. I left there by a Delta flight which arrived from Stuttgart an hour late. We flew for a couple of hours and the captain started familiarizing us with the 'north-west Atlantic corridor' etc. Suddenly I (must be other also) noticed the plane turn around (remember the Colombian coffee commercial?). The captain announced 'We have a very ill person on board who needs serious medical attention and we are flying to Glasgow.' Doctors on board were paged and they all rushed to a lady sitting across the width of the plane from me in my very next row. Announcements were repeatedly made in English, French and German and there was a lot of commotion - the entire flight crew, doctors, paramedics, you name it! After flying for over an hour (we were well over the Atlantic when we turned around) we arrived at Prestwick airport in Glasgow and the plane stooped in the middle of the runway. Ambulances, stairs, and many official looking vehicles with flashing lights approached our plane from all sides. Several people in impressive garb got into our plane.

The lady however, who had a heart attack inside the plane, had passed away on our way to Glasgow. (We were told that she was an elderly German lady coming from Stuttgart to attend a wedding in New York.) All the formalities started. Every person who attended to her and everybody who had a seat near her in the plane, was made to give a statement and those were carefully taped, typed, and signed. An airforce doctor was summoned to examine her and write a death certificate stating the cause of death. The body was released to the British Government and the lady's baggage was taken out of the hold of the plane and handed over. Her carry-on baggage - a cane, a purse, and a raincoat - was handed over too. All this took over five and a half hours. In the mean time our plane had lost access to the north-west Atlantic corridor. The plane was refuelled and we left around the time we were supposed to arrive at New York. By the time we did actually get to JFK airport, all ongoing passengers had missed their connecting flights and it was late at night. The ground crew handled the situation with remarkable efficiency. We were all transported to a hotel with hotel vouchers, dinner tickets and breakfast tickets. After a very restful night in a good hotel and a refreshing shower in the morning, here I am, still flying, after thirty one hours of my leaving Brussels, trying to get home.

# Masks of Papier-mâché

Amitava Sen

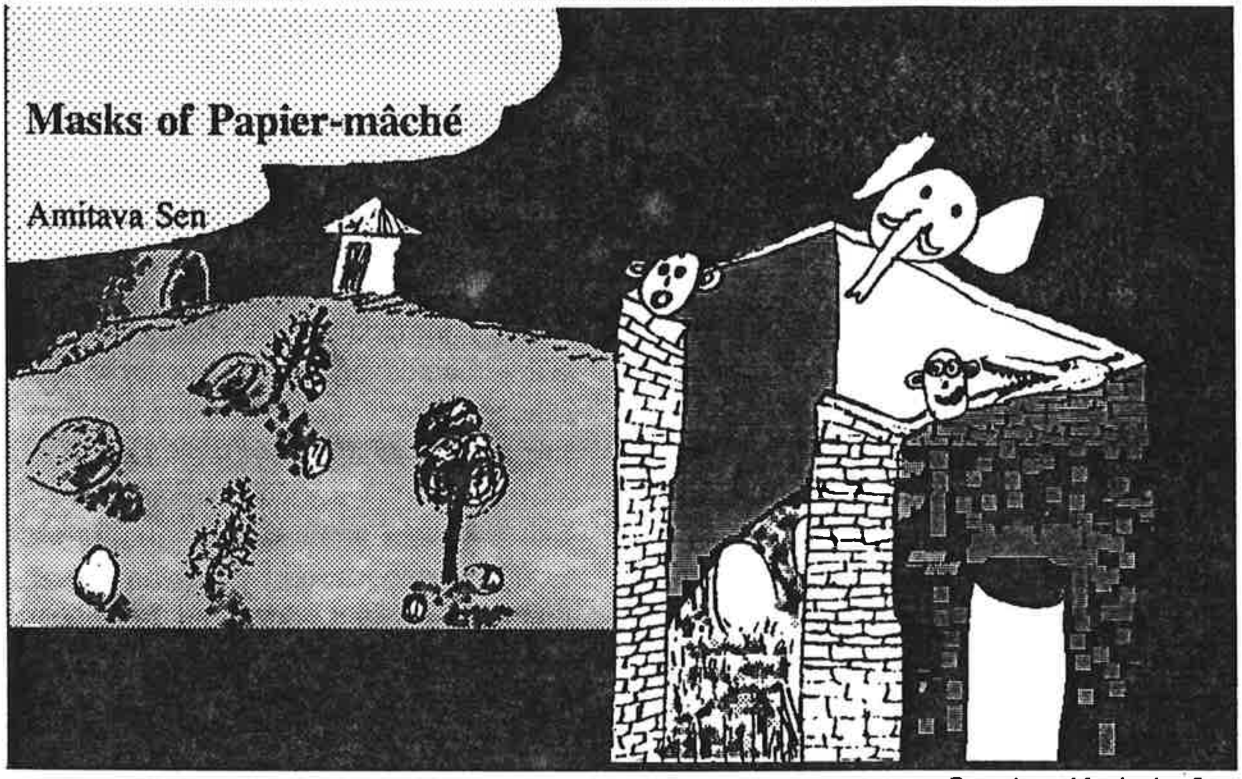

Drawing: Marjorie Sen

When I was little, maybe just a little bigger than you are, we lived in a little white house in Hyderabad. This was our third house in Hyderabad, which we rented even before the house was completely built. And the white paint was fresh on the new walls. The little house stood, it seemed, on a huge, huge field, with no boundaries, and no houses in the neighborhood, as far as the eyes could see.

In the back was a hill, the rocks of which I came to know quite intimately over the next few weeks, and on top of the hill was a temple with a cave. In the cave was a natural stone 'Shiva', and beside the cave was a small hut in which lived the pujari. He used to lure me in with sweets, and I loved to ring the huge bells on the temple at any odd hour, waking up the world from the top of that hill.

In front of the house was a huge field of wild flowers and grass, beyond which was a lake, and on the other side of the lake, a cemetery. It was the final resting place for several Muslims, and was also used for funeral pyres of Hindus; their ashes then mingled with the green algae and wild water lilies of the lake.

Just beside the house, about fifteen feet from our back screened-in dining room/porch, were two graves, one a little larger than the other. We came to believe that these were not Muslim graves but those of sadhus or Hindu saints, most probably the previous caretakers of the cave-temple.

Of course, there were some in our family that didn't like the idea of the graves just beside the dining table, or the cemetery and burning ghat opposite the front door, but for us little folk, it just added to the fun and mystery and romance. It was, from almost all respects, a child's paradise. On that field I learnt to ride a bike, fly kites, and play cricket - that was a few years later when other houses started to fill up the sides of our country lane, and we found enough boys to form teams. And on that hill I climbed rocks, discovered several mysteries of nature, and even went hunting for lizards with a bow and arrow.

The first taste of mystery that was inherent in that house came our way that first summer. An artist friend of the family was at that time teaching us to make masks out of papier-mâché. We had a lot of fun building masks or stage sets for plays, and these were going to be animal masks for a whole set of monkeys and baboons for a children's play to be put up that year during Durga Puja. I might mention in passing, that I played the role of "Hanuman" three times in my life, probably because of all the expertise I gained from jumping amongst the rocks on that hill behind our house: once I jumped on the stage with such force that the hill I was supposed to be carrying on my head (made of papier-mâché, again) flew straight out of my hands to the third or fourth row of the audience! And then there was the time when I sat and ate bananas on the stage 'til I was so full I couldn't remember my lines ... and the time when I jumped off the stage but my tail remained behind ... but those are other stories. Let me come back to this tail (!) of mystery!

Other houses were slowly coming up in the neighborhood by this time, and our landlord had added our boundary walls. He also enclosed the two graves in our backyard with a brick wall, with an opening on the side away from the house. This little enclosure was a favorite place for games of hide-and-seek. My father had meanwhile arranged to have a wonderful grass lawn planted in the back, between the house and the back boundary wall. The lawn was also adjacent on one side to the walls enclosing the two graves.

That evening, after making a batch of masks, we put them out on the brick wall enclosing the two graves to dry. Beside the wall was a large tin. This was refilled with cuttings of old newspapers, scraps of cloth, water, glue, etc. to make another bunch of papier-mâché for the next set of masks.

At night, we got out our camp cots, as usual, on the freshly planted grass lawn. Our family loved the outdoors,

and even at home, we often camped outside. It is a wonderful feeling to lie on cool, slightly-damp-from-dew sheets, gazing at a star-filled sky on a dark summer night.

Everyone had already dozed off, I think, when suddenly I was awakened by a noise. For a while I just opened my ears and lay still, to figure out from where the noise came... I slowly nudged my father who was lying beside me. He sat up and listened. Was there someone in the house? We definitely locked all the doors before turning off the lights. My father took his flashlight, and reached under the bed for his shotgun. Well, at least the gun was there. No one had stolen it from under our noses - or our beds!

This gun has a story - it might just suffice to say here that I've never really seen my father fire it except once - he cleanly shot off the head of a run-away chicken that we had bought for dinner once - the chicken flew away from the hands of the cook (in India you always bought live chicken, not dead meat) and took refuge on our roof. All we could see was its head peeking down at us. Failing to lure it down in any other fashion, my father brought out his shotgun and fired one single shot. The chicken we enjoyed (except for my sister - she was too feeble-stomached to eat it) but its head was never found afterwards.

Anyway, that incident made credible all the stories my father told us of his hunting days in his youth, and just his carrying that shotgun around was enough to get all fears away from my mind. I jumped up and followed him to the house.

The doors were secure. No break-ins. We walked through each room, turned on the lights. I looked under the dining table, behind the sofas, and all my usual hiding places. There was no one in the house. We locked it all up again and came back.

All the rest of that night, I just stayed awake, listening to the owls, to the wind, and finally to the birds as they awoke in the early morning. I must have dozed off finally. Next day as I approached that brick wall surrounding the graves, something struck me as quite unusual. The tin of papier-mâché was not there. I quickly climbed the brick wall to see if our masks were in place. They were, but the tin of papier-mâché was sitting right on top of the bigger grave. It was open, and someone or something had dug into it.

I still wonder - maybe if we hadn't got up and interrupted whatever was happening that night, is it possible we would have discovered a different mask waiting for us the next day on that brick wall?

# Eventide

Yasho Lahiri

There is a sense of presence,
A comfort in being, a beacon through the solitude.
Light dances off the water, silver ripples,
Sun sinks low and tide settles out.
The heat rains down rivulets, salt rivers
Across a face which watches
Passing old men fishing and metal shacks
Redolent of shrimp and fish,
A landscape of lows and water,
A warm green place and yellow sand streaks,
Like piano tinkles across the lush tones of violins.

Here one eye sees for two, one mind perceives
A thought shared, even without speaking,
And casts about for nuggets, moments to bring
As gifts from a seafarer, an explorer
To the queen, in quiet moments shared.
What the fingers touch can be shared
The warp and woof, the fabric of life,
The threads of memory and longing,
Recounting, recalling, and creating,
A future, expectant, builds
Not pianos, not violins,
But human voices, and drums,
In beats older than centuries
In rhythms from some joint, primeval memory.

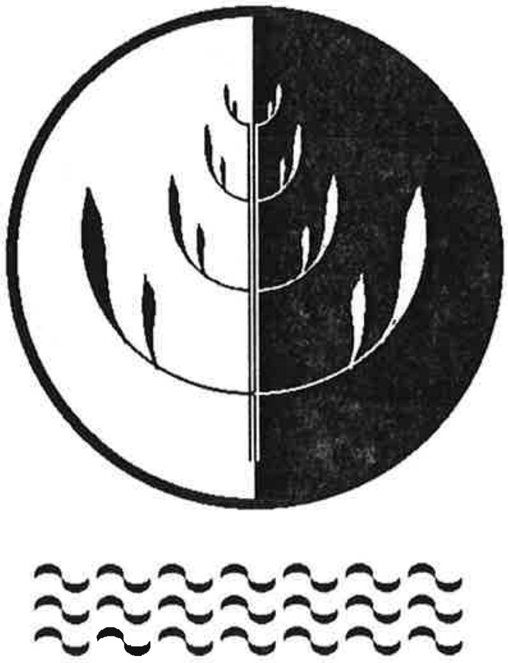

## Have a Voice

Anirban Das

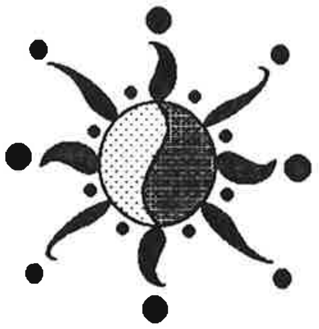

As I look back
on the years that have past,
I see many changes
that have made us a vast
group of people with our own feeling and thoughts.
All should be open and should be brought
up to be discussed.
We are unique individuals who have struggled to survive.
We should all stick together to keep the feeling alive,
in all our hearts - because all we have is each other,
and we are the only ones
who carry the true spirit
of Hinduism and the Indian way.

Unity is important,
in fact it is the only thing
that a culture like our own
should be considering.
We are alone in this wilderness
and left our homes long ago,
if people stick together
no telling how far this may go.
We are the minority and our voices must be heard,
one man cannot do it but we all must converse,
so that our presence is known to all
and people must know
that we are here to stay and give us place on earth.

## Moody Blues

Anirban Das

In everyday,
somewhere, there is a moment
where the world is still.
During this
moment
all eyes feel
they are looking
at
you.
Pressure is
on.
Don't know what to
do. Just want to
cry like a
baby.

# The phone bill that never arrived

Reshma Gupta

The story I am about to write is based purely on facts. Substantial evidence provided are known only through my experience.

June 11th, 1988 at about 1:00 p.m. on a sultry afternoon, I lay sitting with minuscule things on my mind. Staying home alone in the summer was a frequent tradition. It had been not more than seven months since my first arrival in America. At first, I was not pleased, neither was I accustomed to the living arrangements in America, but I survived. I missed my family back home and had a hard time dealing with my feelings. Time passed and things began to change and I became acquainted with the life-style that America offered me.

Well, the story begins after settling down in America. On June 11th, 1988, I did something that I was forbidden from doing. I was left alone at home like every other day in a solitary state of mind. So, I decided to call someone back home. Fortunately, I found a piece of paper lying in the corner on a table counter. This paper contained a bunch of telephone numbers which were very confidential to my parents. There were all kinds of phone numbers but the one that attracted my little eyes was the one titled INTERNATIONAL PHONE NUMBER FOR INDIA as well as my *pishi's* number beside it. At that instant moment my superficial brain told me to pick up the precious phone and start dialing with caution. To tell you the truth, this telephone number was longer than my school ID card. It took me several minutes to dial but with patience I succeeded. Everything went smoothly. After few minutes, I was connected with my *pishi*. She was stunned to hear my voice, but then we talked for more than 30 minutes.

Later that day I told my parents that I called *pishi* and talked for quite a long period. They were so furious with me that they punished me severely.

Days passed, months went by quickly, but the phone bill never arrived! Even after five long years, the bill has still not yet met our acquaintance. Now when I think about it, I just laugh, but sometimes I wonder what really happened to me that crazy afternoon on June 11th 1988. Did it happen or did I just imagine? I leave it up to you, the readers, to judge through my report.

## The departure

Nandini Banik (Charleston, SC)

As my waterfall sheds
to the ground,
    Dripping, Dropping to the ground,
he waves to signal that this was the moment.
I stand observing his face, his profile,
for my memory.

It hurts as I watch him leave,
heading down the narrow, winding
country road.

The life in me is slowly disappearing
as he inches closer towards his destination,
like one's life inches closer to death.

Never shall I encounter someone as
affectionate as he, who grew with me
like an entwining vine
throughout our childhood.

His brotherly love will hold my heart tight
until I see him again.

## Dealing with wealth

Rajarshi Gupta (Columbia, MD)

In this time everyone wants
to be wealthy
To get important things
Basically to be well off
You wish you were
when taxes are concerned
You wish you weren't
when crime is concerned
I wish one of the two
would be gone from life
Maybe even both
I wouldn't care if I were
wealthy or not
Being happy and content
is by itself enough
Not many people
understand that, though
Of course you never know
how it feels
Unless it has happened
to you
So, I wouldn't mind
being rich for awhile
Just to see how it feels.

# The story of Reggie

Priyanka Mahalanobis
(Age - 7)

One day I saw a man named Reggie. He was very handsome and a happy man. One day I became his friend. He told me to come to his house and showed me very good tricks. We both made up a magic act together. From then on we were happy all together. One day there was a storm coming towards us. So I had to go to Reggie's house because my house was not strong enough. And Reggie gave me shelter.

---

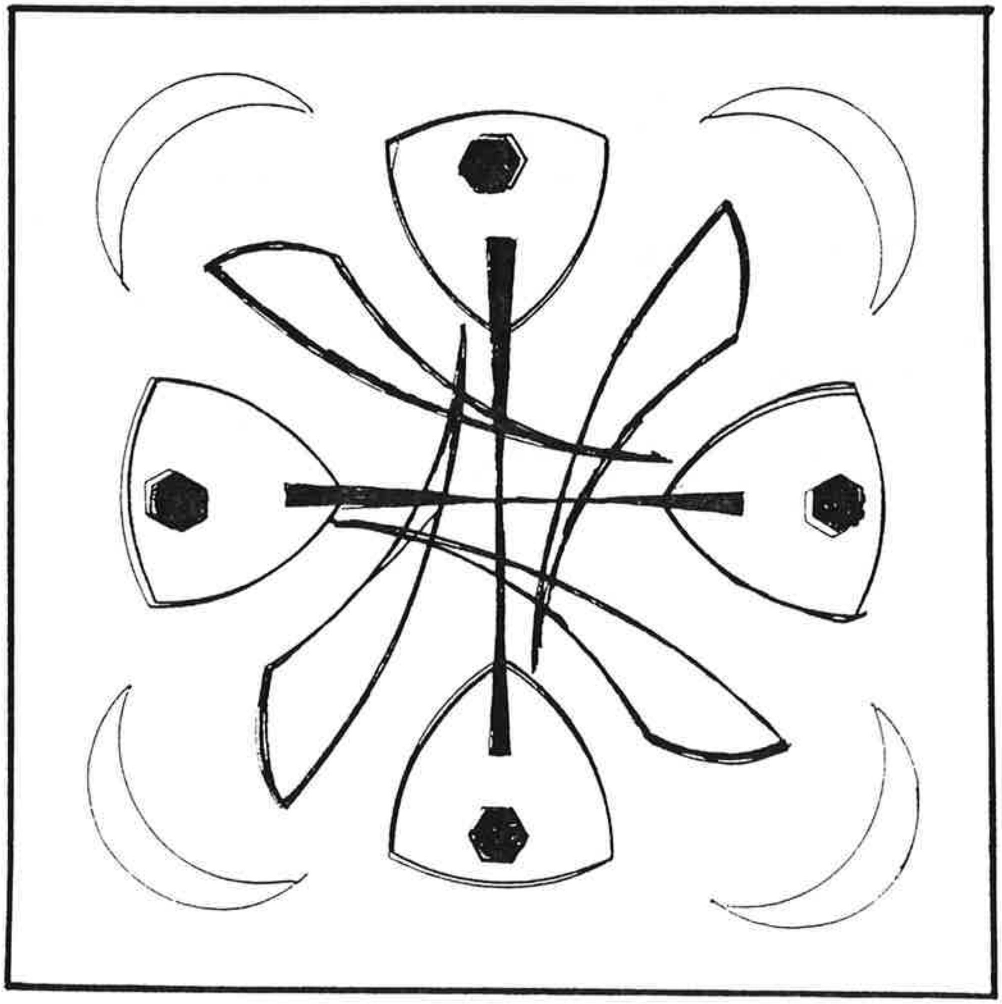

Drawing: Sandip Mitra

# My Dog Daisy

Pia Basu
(Age - 6)

We got Daisy in September 1991 from Riverdale. She has brown eyes and brown fur. She gets wild when she sees golf carts. Everyone says she is cute. She likes to be rubbed on the stomach. She always brings me a ball to play with. She is very playful. I love her best in the family. She is like my little sister. I am glad I have her.

# Entertainment Program - October 3, 1992
## 3:30 PM

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Opening Song | |
| 2. | Dance | Reshma Gupta |
| 3. | Rabindrasangeet | Mahasweta Bhoumik |
| 4. | Dance | Nibedita Banerji, Augusta, GA |
| 5. | "Pujarini"<br>(Dance Drama based on poem by Rabindranath Tagore) | Rupak Das, Sandipan Mitra, Rahul Basu, Purnajyoti Bhaumik, Priyanka Basu, Sonya Banerji, Priyanka Mahalanobis, Jaydip Mukherji, Atasi Das, Reshma Gupta, Anita Banerji, Marjorie Sen, Sutapa Das, Susmita Mahalanobis, Yasho Lahiri;<br>Choreography: Shyamoli Das;<br>Recitation: Samar Mitra, Kalpana Das;<br>Vocals: Mamata Basu, Shanta Gupta, Mahasweta Bhoumik, Maya Mukherji;<br>Violin: Amitava Sen. |
| 6. | Songs | Asok Basu |
| 7. | Group Dance | Aparna Kesarinath, Jaya George, Elsa George, Lekha Abraham, Laksmi Pillai, Nrittya Pillai;<br>Choreography: Kakali Paul, Augusta, GA. |
| 8. | Songs | Indrani Ganguly, Martinez, GA |
| 9. | Instrumental Indian Classical Music | Sangeetkar<br>Violin - Amitava Sen<br>Sitar - M.H. Akmal<br>Rabab - Rafi Akbarzada<br>Harmonium- Bari Akbarzada<br>Tabla - Anil Sharma<br>Tanpura - Jayanti Lahiri |

INTERMISSION

10. Play "Kenaram Becharam" by Manoj Mitra

# Kenaram Becharam

Synopsis of the Bengali play by Manoj Mitra

"Kenaram Becharam" is a comedy with an underlying social theme: the individual's quest for a perfect fit into society's larger entities - the family and the community.

The head of the household, Becharam, has disappeared one morning, leaving behind a note asking the rest of the family not to search for him. His son, daughter-in-law, daughter and son-in-law get into squabbles over the family heirloom - a box of jewelry that was kept in a safe by Becharam, the key to which is also missing. The daughter wants the jewelry to be sold and the proceeds distributed equally between the brother and herself, while the brother and his wife want the heirloom all to themselves.

One day, there suddenly appears Nagen Panja, an agent who finds missing persons and delivers them to their families. He brings Kenaram, an old man whom he rescued from an attempted suicide from the railroad tracks, and tries to fit him into this family as Becharam. Though the family members first get excited (and disappointed) with Becharam's return, they soon discover that he is an imposter. They try to evict Kenaram and Nagen from their house, but to no avail. Nagen seduces each member of the family with promises of becoming the sole heir to Becharam's fortunes, including the advocate Charu Chandra Choudhury (the daughter-in-law's father), and gets them to accept Kenaram as the head of the household in place of Becharam. He even tries to convince the police officer who comes to arrest him that he should become Netaji Subhas Chandra Bose.

Finally, Becharam himself returns one day. He narrates his true story: he was sitting in the park one evening and singing to himself when a theater company approached him and offered him the part of a narrator in their productions. Becharam, disillusioned and unhappy with his own life, had accepted the theater company's offer. Soon he discovered that he did not fit there either. He returned home just as suddenly as he had disappeared. Here he discovers that all of his family, bought by Nagen, has accepted an imposter as their father - all, except his grandson, whose genuine love for him eventually converts the rest of the family.

Nagen has to then take Kenaram away, and try to fit him in another, possibly hilarious, situation.

**Cast (in order of appearance)**

| | | |
|---|---|---|
| Subhendu | (Becharam's son) | : Soumya Kanti Das |
| Dipti | (Subhendu's wife) | : Shyamoli Das |
| Pradeep | (Becharam's son-in-law) | : Somnath Misra |
| Sridhar | (servant) | : M. H. Akmal |
| Budi | (Becharam's daughter) | : Susmita Mahalanobis |
| Nagen Panja | (Private Eye) | : Amitava Sen |
| Charu Chandra Choudhury | (Dipti's father) | : Pranab Lahiri |
| Kenaram | (found person) | : Samar Mitra |
| Toton | (Becharam's grandson) | : Rajarshi Ganguly |
| Bhairab | (a cousin) | : Sougata Mukherjea |
| Police Inspector | | : Amitava Ganguly |
| Becharam | (the missing father) | : Dharmajyoti Bhaumik |

Direction : Jayanti Lahiri
Lights : P. K. Das
Sound : Kiriti Gupta
Music : Indrani Ganguly, Asok Basu, Amitava Sen

---

**Special Thanks for Food, Decoration, Costume, Video, and other help to:**

Achira Bhattacharya
Amitava Sen
Arati Mishra
Asok Basu
Bijan Prasun Das
Bula Gupta
Chaitali Basu
Dharmajyoti Bhoumik
Indrani Ganguly
Jayanti Lahiri
Kakoli Paul
Kalpana Das
Kalpana Ghosh
Krishna Sen Gupta
Mamata Basu
Mamata Ghorai
Mahasweta Bhoumik
Maya Mukherji
Nila Akmal
Pran Paul
Priya Kumar Das
Raksha Banerji
Rekha Mitra
Samar Mitra
Shanta Gupta
Sibani Chakravorty
Shyamoli Das
Sougata Mukherjea
Susmita Mahalanobis
Sutapa Das
Suzanne Sen

PUJARI
Atlanta, Georgia
STATEMENT OF ACCOUNTS

## 1991 DURGA PUJA AND LAKSHMI PUJA

| RECEIPTS | | EXPENSES | |
|---|---|---|---|
| Balance from 1991 Saraswati Puja | $ 509.35 | ICRC Hall Rental | $ 250.00 |
| Donations | $2538.00 | Saris for Pratimas | $ 40.00 |
| Sale of remainders | $ 12.50 | Prasad and food | $1555.10 |
| | | Decoration/Program | $ 189.26 |
| | | Brochure | $ 28.91 |
| | | Van Rental | $ 104.58 |
| TOTAL RECEIPTS | $3059.85 | Miscellaneous | $ 113.44 |
| LESS EXPENSES - | $2281.29 | TOTAL EXPENSES | $2281.29 |
| BALANCE | $ 778.56 | | |

## 1992 SARASWATI PUJA

| RECEIPTS | | EXPENSES | |
|---|---|---|---|
| Balance from 1991 Durga Puja | $ 778.56 | ICRC Hall Rental | $ 295.00 |
| Donations | $ 487.00 | Prasad and food | $ 215.20 |
| | | Decorations | $ 13.57 |
| TOTAL RECEIPTS | $1265.56 | Miscellaneous | $ 15.00 |
| LESS EXPENSES - | $ 538.77 | TOTAL EXPENSES | $ 538.77 |
| BALANCE | $ 726.79 | | |

FRESH GOAT * LAMB * BEEF * CHICKEN

# GEORGIA HALAL MEAT

**1594 Woodcliff Drive - Suite C**
**Atlanta, GA 30329**

**ABBAS MOMIN**

**(404) 315-7224**



আপনার কল্পনাকে সুস্পষ্ট ও সুন্দরভাবে গুছিয়ে প্রকাশ করতে "সম্পাদক"এর সাহায্য নিন।
বাংলা লেখার অভিনব পদ্ধতি - IBM PC তে ব্যবহারের জন্য সফ্টওয়ার এখন বিক্রি হচ্ছে।

*SampadaK*

Multilingual Word Processor

Software for IBM PC and compatibles.

Amitava Sen
945 Nottingham Drive
Avondale Estates, GA 30002
(404) 294-6060

# Vitha Jewelers, Inc.

## A Trusted Name in Jewelry for Over 18 Years

**LONDON • NEW YORK • ATLANTA • CHICAGO**

A large collection of 22 KT Gold Jewelry in Indian Artistic Designs

* RINGS * CHAINS * PENDANTS * NECKLACES *
* MANGALSUTRA * WEDDING BANDS *
* BABY RINGS AND BRACELETS *
* 4 PIECE SETS *

24 KT Gold Bars, Coins, Bangles and Chains

Fine quality CZ Jewelry in 22 KT and Much, Much More

MAIL ORDERS ACCEPTED • REPAIRS DONE ON PREMISES

***SHOWROOMS***

**NEW YORK**

Rajsun Plaza, 37-11 74th st, suite 2
Jackson Hts, NY 11372
(718)-672-GOLD
(718)-672-8146

**ATLANTA**

1594 Woodcliff Dr., Suite B
Atlanta, GA 30329
(404)-320-0112
(404)-320-0267

**CHICAGO**

2651 West Devon Ave.
Chicago, IL 60659
(312)-764-4735
(312)-764-4701